আট আনা সংস্করণ

[৮ম গ্রন্থ]

ময়ূর-পুচ্ছ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ,

প্রণীত



৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রাবণ, ১৩২৪

প্রকাশক—
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য
অন্নদা বুক্ ষ্টল্
৭৮।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত
কয়েকখানি উপন্যাস ও গল্পের বই

১।	ইন্দুমতী (দ্বিতীয় সংস্করণ)	... ...	১৷৹
২।	বিলাতী হাওয়া	... ...	১৷৹
৩।	সইমা (গল্পের বই)	... ...	১।৹
৪।	সুকুমার (সচিত্র গল্পের বই)	... ...	১৲
৫।	স্বামীর ভিটা (গল্পের বই)	... ...	৸৹
৬।	চক্রীর চক্র (অনুদিত উপন্যাস)	... ...	৷৵৹
৭।	ময়ুর-পুচ্ছ	... ...	৷৹
৮।	ছোটবউ (বড় গল্প)	... ...	।৵৹

১২৫৭ 'মানসী' প্রেস
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

অগ্রজ-প্রতিম

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের

করকমলে

উপহার-পৃষ্ঠা

এই পুস্তকখানি

আমার

....

....কে

....

প্রদত্ত হইল।

স্বাক্ষর..........................

তারিখ................
সন................

....

....

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপায় আমাদের আট আনা সংস্করণের ৮ম গ্রন্থ "ময়ূর-পুচ্ছ" প্রকাশিত হইল, সুলভে সং-সাহিত্যের প্রচারোদ্দেশে—এই কাগজের মহার্ঘতার দিনে—ক্ষুদ্রশক্তি আমরা এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, তখন বুঝিতে পারি নাই আমরা ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না,—এখন সাহিত্য-সুহৃদের স্নেহদৃষ্টি ও শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপা এতদুভয়ই আমাদের এই 'সিরিজে'র অক্ষয় কবচ স্বরূপ হইয়াছে।

পরিশেষে সাহিত্যানুরাগি-মহোদয়গণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদের এই 'সিরিজে'র তথা বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। **কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, মাত্র পত্র লিখিয়া গ্রাহক হইলে** যে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভি, পি, ডাকে পাঠাইব এবং যখন যে খানি প্রকাশিত হইবে তখন সেই খানি ভি, পি, ডাকে পাঠাইব। এই 'সিরিজে'র নবম গ্রন্থ যন্ত্রস্থ। ইতি—

সিংহ-সংক্রান্তি
১৩২৪



ময়ূরপুচ্ছ।

NEW SARASWATI PRESS

ময়ূর-পুচ্ছ

[১]

কবে কোন্ দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ গুঁজিয়া ময়ূর সাজিতে গিয়া 'ইতোনষ্টস্ততোনষ্টঃ' হইয়াছিল, তাহার সঠিক খবর অবশ্য আমি জানি না। তবে মানুষের মধ্যে আমি অনেক ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাক দেখিয়াছি এবং আমি তাহাদেরই একজন—সেই কথাই বলিব। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, আমার সহপাঠী বন্ধু আমার এই ময়ূর-পুচ্ছ সাজিবার গল্পটি বলিবে, কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিলাম, তাহাতে একটু অসুবিধা আছে। কেন না সে শুধু গল্পই বলিত, আমার মনের ভিতর কখন কি ভাবলহর খেলিয়া যাইত, তাহা ত সে বর্ণনা করিতে পারিত না। তাই আমি নিজেই নিজের কথা বলিব। একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি, এই ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাকের দলকে আমি সোজাকথায় ময়ূর-পুচ্ছ আখ্যাই প্রদান করিয়াছি।

সামান্য গৃহস্থের ঘরে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতি শিশুকালে আমি জনকজননী দুই-ই হারাই। ঠাকুর্দ্দা ও ঠাকুরমার কাছেই আমি মানুষ। মানুষ বলিতে যা বুঝায়, ঠাকুর্দ্দা-ঠাকুরমার আদুরে-গোপাল আমি সে রকমের মানুষ হই নাই। নিয়মিত স্কুলে গিয়াছি, বইও যখন যাহা আবশ্যাক এবং যাহা অনাবশ্যক তাহা আমি ইচ্ছানুরূপই কিনিয়াছি, তবে পরীক্ষার গণ্ডী আমি কিছুতেই উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। যাহ'ক আমি মানুষ হইয়াছি, অর্থাৎ ছোট হইতে বড় হইয়াছি, অবশ্য আকারে ও বয়সে। ঠাকুর্দ্দা দেখিলেন যখন আমি কিছুতেই সরস্বতী দেবীর কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে কৃতকার্য্য হইলাম না, তখন অগত্যা তিনি আমায় চাকুরীতে ভর্ত্তি করিলেন এবং একটী হাস্যমুখী, লাবণ্যময়ী বালিকা-বধূ আনিয়া আমার গৃহ ও অন্তরের শূন্যতা পূরণ করিয়া দিলেন। বালিকা-বধূ অনিমা আমার হৃদ্‌সাগরে প্রেমের বন্যা বহাইয়া শশিকলার মত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি সেই মুখখানি মনে করিতে করিতে আপিস যাইতাম, মাঝে মাঝে আপিসের কাজ ফেলিয়া কলম হাতে করিয়া সেই মুখখানি ভাবিতাম এবং উপরওয়ালার কাছে কড়া কড়া কথা শুনিতাম। আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া সেই মুখখানি

দেখিবার জন্য বারবার উপর-নীচ করিতাম। ঠাকুরমা আমার অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, তিনি অনিমাকে ধরিয়া আমার কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া যাইতেন। অনিমা দুই একটা কথা বলিয়াই ঠাকুরমার কাছে পলাইয়া যাইত; ঘরে কতগুলি কড়ি ও বরগা আছে আমি বার বার তাহাই গুণিতাম। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বাড়ীর সম্মুখের রেলিং-ঘেরা মাঠে গিয়া বসিতাম; মস্ত ভাবুকের মত আকাশের দিকে চাহিয়া মেঘের খেলা দেখিতাম।

আমি একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। মনে করিবেন না, আমি শুধুই একজন নীরস মসীজীবী। আমার কলম হইতে সরস গদ্য ও পদ্য বাহির হইত। বাড়ী বসিয়া প্রবন্ধ ও কবিতার মধ্য দিয়া আমি আমার কিশোরী পত্নীকে ফুটাইয়া তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতাম। আমার নিজের রচনা করিবার কোন ক্ষমতা থাকুক আর না থাকুক, আমি চেহারাখানা অন্ততঃ কবির মত করিয়া ছিলাম। নরসুন্দরকে অনেক পয়সা দিয়া, বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া আমি কবির অনুরূপ শ্মশ্রু-গুম্ফে শীর্ণ মুখখানির এবং বাবরিচুলে মস্তকের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলাম। চশমার দোকানে গিয়া চোখ ঈষৎ খারাপ হইয়াছে বলিয়া একখানি নাকে-আঁটা চশমা সংগ্রহ করিয়া

চোখদুটাকে সত্যই প্রায় খারাপ করিয়া তুলিয়াছিলাম। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি।—ফরাসী ধরণের দাড়িতে আমাকে বেশ মানাইয়াছিল ; অনেককে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি এবং আমার নিজেরও তাহাই বিশ্বাস ছিল।

যাক্ সে কথা। আমি সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া সোজা উপরের ঘরে গিয়া কাপড় জামা ছাড়িয়া দোয়াত কলম লইয়া বসিতাম। সুন্দরীর পায়ের মলের ঝমঝম্ শব্দের সহিত কিসের তুলনা করা যায়,-তাহাই ভাবিতাম ; আর উৎকর্ণ হইয়া থাকিতাম, কখন আমার অনিমার মলের ঝম্‌ঝম্ শব্দ শুনা যায়।

ঠাকুরম্মার কাছে প্রায়ই ধরা পড়িয়া যাইতাম। তিনি আমার ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিতেন, "অ অনু, অমন মলের ঝম্‌ঝম্ শব্দ করে বেড়াস্‌নি রে, এ বেচারার যে লেখাপড়া সব ঘুচে যাবে।"

আমিও হাসিয়া বলিতাম, "ঠাকুরমা, তুমি সব মাটি করে দিলে, ওতে কবিতা যে খুব জমে।"

সেদিন আর বড় মলের শব্দ পাওয়া যাইত না। বুঝিতে পারিতাম, অনিমা মল কয়গাছি পায়ের উপর তুলিয়া হাঁটিত। এমনই করিয়া বড়সুখে দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল।

[২]

একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মাঠের মধ্যে বসিয়াছিলাম। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নভোমণ্ডলের পশ্চিমাংশে সোনার দেশ জ্বলজ্বল করিতেছে, এখানে সেখানে আমাদেরই এই পৃথিবীর মত কাল কাল ছোট বড় পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি তন্ময় হইয়া সেই শোভা দেখিতেছিলাম।

এমন সময় আমারই একজন প্রতিবেশী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিল, "ওহে সুরেশ, তোমাকে যে চন্দ্রবাবু খুঁজছেন ?"

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "হাঁহে চন্দ্রবাবু কে ?"

প্রতিবেশী কহিল, "আরে চন্দ্রবাবুকে চিনলে না, টালার জমিদারবাবু।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, "জমিদার চন্দ্রবাবু! তিনি আমায় খুঁজছেন, কেন, কি ব্যাপার ?"

এমন সময় একটী গৌরকান্ত যুবক সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই প্রতিবেশী কহিল, "এই যে আমাদের সুরেশ।" আমি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তিনি আমার হাত ধরিলেন। আমার

দেহমন পুলকিত হইয়া উঠিল। যাহাদের অদৃষ্টে এরূপ সৌভাগ্য ঘটে নাই, তাহাদের আমি আমার তখনকার মনের ভাব ও দেহের অবস্থা কিছুতেই বুঝাইতে পারিব না। তাহা অনুভূতির দ্বারা বুঝিবার বস্তু, বুঝাইবার নহে। আমার মনে হইল, কি সৌভাগ্যরে!

চন্দ্রবাবু হাত ধরিয়াই বলিলেন, "আপনি সুরেশবাবু! আপনাকে যে চেনা-চেনা ঠেক্ছে। কোথায় দেখেছি বলুন দেখি?"

আমি হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার মত লোক যে আমায় কোথায় দেখিতে পারেন, তাহা ত আমি ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিলাম না। তিনি আবার হাসিয়া কহিলেন, "আপনি বোধ হয় ঠিক মনে করতে পারছেন না। তাতে অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? এইবার ত পাকাপাকি রকমের চেনা-শুনা হয়ে গেল; এর পরে ত আর কেউ কাকে ভুলব না। আপনি শুনলাম একজন বড় সাহিত্যিক। আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া বিশেষ সৌভাগ্যের কথা বলতে হবে!"

আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, "আপনি ও সব কি বলছেন! আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া যে কত পুণ্যের ফল—।"

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, "সে কি, সে কি! আমরা হলাম মুখ্যুসুখ্যু লোক, আর আপনি হলেন একজন মস্ত পণ্ডিত, কার সঙ্গে কার তুলনা করেন। জানেন ত চাণক্য কি বলে গেছেন,—

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

আমি মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিলাম। তিনি এক নিঃশ্বাসে এত বড় একটা সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিলেন, আর আমি কিছু বলিতে পারিব না! প্রাণপণ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সে দিন বিশ্বেশ্বর কি একখানা সংস্কৃত বই পড়িতেছিল, আমি পাশে শুইয়াছিলাম। তাহারই একছত্র হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া গেল। মহানন্দে আমি প্রায় লাফাইয়া উঠিলাম, হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "কিন্তু দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।"

চন্দ্রকান্তবাবু বলিলেন, "ও বাজে কথা, ও কোথাকার কে লিখে গেছে তার ঠিক নেই। চাণক্যের মত অত বড় পণ্ডিত ভূ-ভারতে আছে! আপনি কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন! আপনারা চিরকালই আমাদের চেয়ে বড় থাক্‌বেন। যাক্ ও কথা, আচ্ছা সুরেশবাবু, আপনার

ত এখন বিশেষ কোন কাজ নেই, চলুন একটু গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসি।”

আমি বিস্মিত, আনন্দিত এবং কিঞ্চিৎ ভীত হইলাম। কলিকাতায় এত লোক থাকিতে আমার মত সামান্য লোকের উপর এত কৃপাদৃষ্টি কেন? এই কথাই কেবল আমার মনে উঠিতে লাগিল। ভাবিলাম, অদৃষ্ট অদৃষ্ট! অদূরেই তাঁহার জুড়ি দাঁড়াইয়াছিল। আমার হাত ধরিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন।

পথে যাইতে যাইতে নানা কথার পর তিনি বলিলেন, “আপনি যদি আমার একটি উপকার করেন সুরেশবাবু?”

আমি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম, “আমি—আমি, আপনার কি উপকার করতে পারি?”

তিনি বলিলেন, “খুব বেশী উপকার করতে পারেন।”

আমি মহাখুসী হইয়া বলিলাম, “আপনার এতটুকু কাজে লাগতে পারলে, আমি বিশেষ সৌভাগ্য বলে মনে করব।”

চন্দ্রবাবু বলিলেন, “আপনি বোধ হয় কাগজে দেখেছেন আমি লাট-কাউন্সিলের মেম্বর হবার জন্য দাঁড়িয়েছি।”

আমি ইংরেজী বা বাঙ্গালা খবরের কাগজ বড় পড়ি না। কিন্তু চন্দ্রবাবুর কাছে ত কিছুতেই সে কথা স্বীকার

করিতে পারি না। কাজেই বলিয়া ফেলিলাম, "দেখোছ বই কি।"

চন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন, "আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার জন্যে দুই একটা ভোট জোগাড় করে দেন।"

আমি কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "বেশ, তা দেব।"

চন্দ্রকান্তবাবু বলিলেন, "আপনাকে বেশী কিছু করতে হবে না। আপনার মামা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের একজন মেম্বর, তাঁর ভোটটা পেলেই আমার হবে; তা ছাড়া সেখানে যদি আরও দুই একটা ভোট জোগাড় করতে পারেন, সে আরও ভাল।"

তখন একবার ভাবিয়া দেখি নাই, মেম্বরপদপ্রার্থীরা ডিটেক্‌টিভকেও টেক্কা দেয়! এই বিরাট কলিকাতা সহরের কোন্ এক কোণে আমি পড়িয়া থাকি—আমার সন্ধান, শুধু আমার নয় আমার মামার সন্ধান করা বড় সহজ কথা নহে! এখন মনে হয়, এই মেম্বরপদপ্রার্থীদের প্রত্নতত্ত্ববিভাগে অবৈতনিক কোন কাজ দিলে, ইঁহারা অতি দক্ষতার সহিত তাহা চালাইতে পারিতেন।

আমি উচ্ছ্বসিত আনন্দে কহিলাম, "এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ভোটের জন্যে আমি দায়ী রহিলাম, অন্য তিনটি ভোটও আমি জোগাড় করে দেব।"

চন্দ্রকান্তবাবু আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “ধন্যবাদ, শত শত ধন্যবাদ! দেখুন আর একটা কথা,—কাল ভোরের গাড়ীতেই আপনাকে দয়া করে বেরুতে হবে; না হলে দেরী হয়ে যাবে।”

আমি পরের চাকুরী করি,—সামান্য মার্চ্চেণ্ট আপিসের কেরাণী, বিনানুমতিতে আপিস কামাই করিলে মাহিনা কাটা ত যাইবেই, উপরন্তু চাকুরী যাইবারও সম্ভাবনা। সে সব কথা কিন্তু আমার মনে আসিল না। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কথামত যাত্রা করিতে স্বীকৃত হইলাম।

তিনি আমার হাতে দশ টাকার একখানি নোট দিয়া বলিলেন, “আপনার গাড়ী ভাড়া।”

আমি নোটখানি ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম, “মশায় বলেন কি, এই সামান্য কাজের জন্যে আপনার কাছে গাড়ী ভাড়া নেব! সে ত আমার মামার বাড়ী, এমন মাঝে মাঝে সেখানে ত গিয়েই থাকি।”

তিনি দুই একবার, সে কি হয় মশায়, সে কি ভাল দেখায় মশায়, বলিতে বলিতে নোটখানি মনিব্যাগে রাখিয়া দিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া ঠাকুরমাকে সব কথা বলিলাম। অনিমাও তখন ঘোমটা দিয়া ঠাকুরমার পিছনে বসিয়াছিল।

কালই যাইতে হইবে এই কথা শুনিবামাত্র সে একবার চকিতে আমার দিকে চাহিয়া মুখ নীচু করিয়া রহিল। দেখিলাম, মুখখানি ভারি বিষণ্ণ।

ঠাকুরমা আমায় বলিলেন, "কি করতে যাবি! বড় লোকের উপকার করে কোন লাভ নেই; তারা গরীবের কথা বড় মনে রাখে না।"

আমি ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলাম, "সব বড় লোক কি এক রকম হয়! আমার ত মনে হয়, চন্দ্রবাবু অতি মহৎ লোক।" আমায় চন্দ্রবাবু সত্যই যেন যাদু করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই স্পর্শ, সেই কণ্ঠস্বর এখনও যেন আমার দেহকে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিতেছিল।

ঠাকুরমা আবার হাসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁরে অনুকে ছেড়ে অতদিন থাকতে পারবি?" অনিমার দিকে একবার গোপনে চাহিয়া লইলাম। সে তখন ঠাকুরমার পিঠে মুখ লুকাইয়াছিল। উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ঠাকুরমা আবার বলিলেন, "তা আমায় মারলে কি হবে অনু, সুরোর দুটো কাণ ধরে বল না, কখনও যেতে পাবে না। দেখব ওর সাধ্যি কি করে যায়।"

আমি কাতর হইয়া বলিলাম, "ঠাকুরমা কথা যে দিয়ে ফেলেছি।"

তিনি কহিলেন, "দিয়েছিস তাতে হয়েছে কি! চার পাঁচ দিন চুপচাপ করে বাড়ী বসে থাক। তার পর তার সঙ্গে দেখা হলে বলিস—হল না। সে কি না শুধু তোর ভরসাতেই বসে আছে।"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "তা হতে পারে না ঠাকুরমা, আমি মিথ্যে কথা কিছুতেই বলতে পারব না।" মোহ! মোহ—যাদুকরের দারুণ মোহে আমার সমস্ত দেহমন আচ্ছন্ন। পত্নীর বিরহ, ঠাকুরমার নিষেধ কিছুতেই সে মোহ কাটিল না। রাত্রেই আপিসে একখানি চিঠি লিখিয়া দিলাম। পর দিন ভোর হইতে না হইতেই একটা ব্যাগ হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

[৩]

মনে করিয়াছিলাম, তিন চারিদিনের মধ্যেই ফিরিব; কিন্তু ফিরতে প্রায় দশদিন বিলম্ব হইয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখিলাম,—ঠাকুরমা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই সত্য; চন্দ্রবাবু আমার ভরসায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার কর্ম্মচারী সেখানে উপস্থিত হইয়া ভোটসংগ্রহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আমার মাতুল-মহাশয়কে কিছুতেই রাজি করিতে পারেন নাই। চন্দ্র

বাবুর কর্ম্মচারী সত্যই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন সময় আমি গিয়া উপস্থিত।

বহুদিন পরে মামাবাবু আমাকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। এ কথা সে কথার পর তাঁহাকে আমি ভোটের কথা বলিলাম। তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কিছু উপকার হবে বলতে পারিস ?"

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম, "হবে বৈকি মামা বাবু, চন্দ্রবাবু যে আমার বিশেষ বন্ধু।" মামাবাবু আর কিছু বলিলেন না। বুঝিলাম, কাজ উদ্ধার হইবে।

পরদিন মামাবাবু চন্দ্রবাবুর কর্ম্মচারীকে বলিলেন, "চন্দ্রবাবুকে গিয়ে বলবেন, সুরেশের জন্যেই আমি তাঁকে ভোট দেব। আমি জানতাম না তিনি সুরেশের বন্ধু।"

দশদিন পরে আমি বিজয়গর্ব্বে বাড়ী ফিরিলাম। শুধু মামাবাবুর ভোট নহে, মামাবাবুর চেষ্টায় আমি আর একটী ভোটও সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছি।

ঠাকুরমা আমাকে দেখিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "কি গো বাবু, বাড়ীর কথা এতদিনে মনে পড়েছে, আমি না হয় বুড়ো-হাবড়া হয়েছি কিন্তু অনিমার ত এখনও বয়েস যায় নি ; এর মধ্যে এমনই বৈরাগ্য !"

'ঠাকুরমা এ কথা বলিতে পারেন!' কেন না আমি

নিজেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না, কিসের নেশায় বিভোর হইয়া আমি এই দীর্ঘ দশদিন অনিমার কাছ-ছাড়া হইয়া ছিলাম ! আমার মন বার বার বলিতে লাগিল, কি সে !

ঠাকুরমা হাসিয়া কহিলেন, "দেখছিস অনু, এই-বার তোর আর এক সতীনের সঙ্গে ঘর করতে হবে। এতদিন আমিই একলা তোর সতীন ছিলাম, এইবার চন্দ্রমণি সতীন হয়ে বসল। আমরা দুই সতীন যদি এক হয়ে কোমর বেঁধে লাগি, তা হলে কি পেত্নীটাকে ওর ঘাড় থেকে নামাতে পারব না ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঠাকুরমা তোমার কেবল দুষ্টুমি।"

এমন সময় বিশ্বেশ্বর আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। অনিমা উঠিয়া পার্শ্বের ঘরে দ্বারের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল। আমাকে দেখিয়া বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিল, "এই যে সুরেশ ? আমার ত ভয় হয়েছিল, নতুন বড় লোক বন্ধু পেয়ে শেষে বুঝি এ গরীবদের কথা ভুলে গেলি।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "তোরা সবাই দেখছি বড়লোকের ওপর চটা ! তারা কি আমাদের মত মানুষ নয় ? তারা কি আলাদা জীব ?"

ঠাকুরমা বলিয়া উঠিলেন, "ওরে বিশু, ওকে বড়লোক-ভূতে পেয়েছে, ও ভূত আপনি না ছাড়লে, ছাড়ান বড় শক্ত। তবে ভয় নেই—ওসব ভূত গরীবের ঘাড়ে বড় বেশী দিন চেপে থাকে না। যে রকম বুঝছি কিছুদিন কষ্ট দেবে। যাও গো ঠাকুর, তোমার বড়লোক বন্ধুকে শুভবার্ত্তা দিয়ে এস।"

বিশ্বেশ্বরের নাম দুই দুই বার উল্লেখ করিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন পরিচয় দিই নাই। তাহার সহিত আমার এই গল্পের বিশেষ সম্পর্ক, কাজেই তাহার পরিচয়-দেওয়াও আবশ্যক।

আমার নিজের অবস্থার কথা আগে একটু ভাঙ্গিয়া বলি। আমি গরীব, মধ্যবিত্ত, না বড়লোক—কোন্‌টা তাহা আপনারা পাঁচজনেই স্থির করিয়া লইবেন—আমি কিছু বলিব না। আমাদের সম্পত্তির মধ্যে ছিল কলিকাতায় দেড়কাঠা জমি, তাহারই উপর একটি দ্বিতল গৃহ; ঠাকুর্দ্দা মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাহিনা পাইতেন, তাহাতে আমাদের তিনটী প্রাণীর (অবশ্য আজ তিন বৎসর হইল একটি প্রাণী বৃদ্ধি হইয়াছে) বেশ চলিয়া যাইত। ঠাকুর্দ্দা খুব হিসাবী ছিলেন। ঐ টাকা হইতেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেন, মাসে আবার দুই একটী টাকা

দানধ্যানও ছিল। তার পর ঠাকুর্দ্দা পেন্সন লইলেন, মাসিক আয় আমাদের পঁচিশ টাকা দাড়াইল। সংসারে কিছু কষ্ট হইল। ঠাকুর্দ্দা কিছু কিছু পুঁজি ভাঙ্গিতে লাগিলেন। এই ভাবে বছর খানেক চলিবার পর আমার পঁচিশ টাকা মাহিনার একটী চাকুরী হইল। অনিমাও সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গৃহ আলোকিত করিল। আবার সেই পঞ্চাশ টাকায় সংসার বেশ চলিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর পিতৃমাতৃহীন—তাহার মাথা গুঁজিবার মত সামান্য একখানি কুঁড়েও নাই। সে তাহার পিসে-মহাশয়ের বাড়ী আশ্রয় লইয়াছে। আমি যে স্কুলে পড়িতাম, সেও সেই স্কুলে পড়িত। প্রতিমাসেই তাহার মাহিনা দিতে দেরী হইত; সে শিক্ষকদের নিকট কটুকথা শুনিত, কিন্তু কিছুই বলিত না, শুষ্কমুখে বসিয়া থাকিত। তবে সে পড়া-শুনায় বিশেষ মনোযোগী ছিল বলিয়া শিক্ষকেরা অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে জরিমানা করিতেন না। এই ভাবে সে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিল। দুই একমাস স্কুলে আসিবার পর সে একদিন হেডমাষ্টার মহাশয়কে গিয়া বলিল, "আমার নাম কেটে দেবেন, আমি আর পড়ব না।"

হেডমাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "কেন?"

সে ম্লানমুখে বলিল, "পিসেমশায় আর মাইনে দিতে পারবেন না।"

হেডমাষ্টারমহাশয় সহানুভূতিপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন, "ফ্রিসিপ সব পূরে গেছে, না হলে তোকে ফ্রি করে দেবার চেষ্টা করতাম। আচ্ছা দিন সাতেক পরে এসে একবার দেখা করিস যদি কিছু সুবিধে করতে পারি।"

বিশ্বেশ্বর চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল। আমি তখন বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলাম। ছেলেদের আড়ি পাতিয়া শোনা একটা অভ্যাস। আমিও সেই বালসুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বেশ্বরের কথা শুনিতে আসিয়াছিলাম। সে বাহিরে আসিতেই আমি তাহার হাত ধরিলাম।

সে জলভরা চোখে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার ভাই কাল থেকে স্কুলে আসা হবে না।"

আমি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলাম, "আমি সব শুনেছি বিশু, তুই পড়া ছাড়িসনে, আমি তোর মাইনে দেব।"

বিশ্বেশ্বর অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুই ভাই টাকা কোথায় পাবি?"

আমি উৎসাহপূর্ণকণ্ঠে কহিলাম, "কেন, ঠাকুর্দ্দা দেবে।"

বিশ্বেশ্বর গাঢ়স্বরে কহিল, "তোর ঠাকুর্দ্দা বুঝি খুব বড়লোক? কিন্তু তিনি ত ভাই আমায় চেনেন না, টাকা দেবেন কেন? মাইনে আড়াই টাকা তা ত জানিস ভাই?"

আমি বলিলাম, "তা আর জানি নি—আমিও ত ফি মাসে মাইনে দিচ্ছি। ঠাকুর্দ্দা ঠিক দেবে।"

বিশ্বেশ্বরের মুখ দেখিলাম গভীর আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "কাল থেকে তা হলে স্কুলে এসে বসবো?"

আমি জোর দিয়া কহিলাম, "নিশ্চয়ই।"

পরদিনই আমি তাহার মাহিনা আনিয়া দিলাম, সেই অবধি সে আমার কেনা হইয়া রহিল। এখন যদিও সে বৃত্তি পাইয়া কলেজে পড়িতেছে, তথাপি অভাব পড়িলে আমি তাহাকে দুপাঁচ টাকার বই কিনিয়া দিই। ঠাকুর্দ্দা ঠাকুরমারও সে স্নেহাকর্ষণ করিয়াছিল। এমন পরমাত্মীয়, এমন বন্ধু পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়। আমি লেখা পড়া শিখিতে পারি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গলাভ করিয়া আমি আমার চরিত্র-গঠন করিতে পারিয়াছিলাম। সে

দিবারাত্র আমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রাখিলে আমি হয় ত কুসংসর্গে মিশিয়া নিজের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিতাম।

যাক্ সে কথা। আমি তখনই ভাল কাপড়-জামা ছাড়িয়া চন্দ্রকান্তবাবুর বাটী গিয়া উপস্থিত হইলাম। চন্দ্রবাবু মহাসমাদরে আমায় অভ্যর্থনা করিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন, "আমার লোকের মুখে সব শুনেছি। আপনাকে না পেলে আমার সব মাটি হয়ে যেত। আপনার মামা যখন কথা দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর ভোটটা পাব, তা ছাড়া আর একটা ভোটও ত আপনি ঠিক করে এসেছেন। যত পাওয়া যায় ততই নিরাপদ। আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব, তার উপযুক্ত কথাই খুঁজে পাচ্ছি না। ওরে কে আছিস, শীগ্‌গির বাবুর জলখাবারের আয়োজন করে দে।"

আমি জোড় হাত করিয়া কহিলাম, "মাপ করবেন, আমাকে এখনই ভাত খেয়ে আপিস যেতে হবে। এখন আর কিছু খাব না।"

চন্দ্রবাবু কোন কথা শুনিলেন না, জোর করিয়া আমাকে অন্য এক ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে দেখিলাম, জলযোগের প্রচুর আয়োজন।

বিদায় লইবার কালে চন্দ্রবাবু বলিলেন, "মাঝে মাঝে আমার এখানে যেন পায়ের ধূলো পড়ে।"

আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, "বিলক্ষণ! আপনি ওসব কি বলছেন।"

বাড়ী ফিরিয়া নামমাত্র দুটি ভাত মুখে দিয়া আপিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বড়বাবু আমাকে দেখিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "ওহে সুরেশ, কি করব বড়সাহেব কিছুতেই শুনলে না। তোমার মাহিনা চুকিয়ে দিতে বলেছেন।"

আমি কম্পিতকণ্ঠে বলিলাম, "কেন মশায়, আমি ত চিঠি লিখে ছুটি নিয়েছিলাম।

বড়বাবু কিঞ্চিৎ রূক্ষস্বরে বলিলেন, "অতদিন ছুটি চাইলে কি পাওয়া যায়! তোমার জায়গায় সাহেব নতুন লোক নিয়েছেন। একটু বস, আমি তোমার মাইনে আনিয়ে দিচ্ছি।"

আমি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইলাম। কত কষ্টের চাকুরী! চাকুরী গেলে যে সংসারে কষ্ট হইবে! আমি কাতরকণ্ঠে বড়বাবুকে বলিলাম, "আপনি যদি দয়া করে সাহেবকে একটু বলে দেখেন?"

বড়বাবু নিজের কাজে মনঃসংযোগ করিয়া বলিলেন,

"যা হবে না তার জন্যে সাহেবকে আমি বলতে পারি না। আর এসব অন্যায় কথা সাহেব শুনবেনই বা কেন?"

আমি শেষে বলিলাম, "আমি নিজে গিয়ে বড়সাহেবকে একবার ধরি। চাকরী ত গেছেই, একবার শেষ চেষ্টা দেখতে ক্ষতি কি!"

বড়বাবু বিদ্রূপপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন, "তা দেখ গিয়ে! বড়সাহেব তোমাকে দেখলে ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করবেন!"

তবুও আমি বড়সাহেবের সহিত দেখা করিব স্থির করিলাম। কিন্তু আপিসের একজন কেরাণীবন্ধু আমায় চুপিচুপি একপাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "ওহে সব পথ বড়বাবু মেরে রেখে দিয়েছেন। বড় সাহেবের কাছে গেলে অনর্থক অপমানিত হবে; একখানা সার্টিফিকেটও পাবে না। তার চেয়ে বড়বাবুকে ধরে একখানা সার্টিফিকেট জোগাড় করে অন্যত্র কাজের চেষ্টা দেখ। তোমার কাজে বড়বাবর এক শালা ভর্ত্তি হয়েছে: বুঝলে!"

আমি এই বন্ধুটীর কথা সমীচীন স্থির করিয়া মাহিনা বাবদ দশটী টাকা ও একখানি সার্টিফিকেট লইয়া ব্যথিত অন্তরে বাড়ী ফিরিলাম। পথে যাইতে যাইতে আমার

মন বলিল, "ভাবনা কি, চন্দ্রবাবুর মত বড়লোকের সঙ্গে যখন তোমার বন্ধুত্ব হয়েছে, তখন তোমার ভাবনা কিসের!"

আমি খুব আশান্বিত হইলাম। হারে যাদুকর! ঠাকুরমাকে চাকুরী যাওয়ার সংবাদ দিতে তিনি বলিলেন, "বড়লোকের উপকার করতে গিয়ে এই ত লাভ হ'ল; তখনই ত বারণ করেছিলাম! এখন তোর বড়লোক বন্ধুটিকে গিয়ে বল দেখি, একটা চাকরী করে দিতে, দেখি কি বলে।"

আমি বলিলাম, "তুমি দেখ না ঠাকুরমা, চন্দ্রবাবু যদি শোনেন আমার চাকরী নেই, তখনই একটা চাকরী করে দেবেন। তিনি লাট-কাউন্সিলের মেম্বর হচ্চেন, তাঁর হাতে কত বড় বড় চাকরী থাকবে। সাহেবদের একটা কথা বলে দিলে আবার চাকুরীর ভাবনা! ঠাকুরমা আমি ত আর যেচে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে যাই নি, তিনিই আমার কাছে এসেছিলেন। আমার ত মনে হয় ঠাকুরমা, এ ভগবানের অনুগ্রহ।"

[৪]

মাসতিনেক কবিতা ও প্রবন্ধ নকল করিয়া মাঝে মাঝে চাকুরীর চেষ্টা করিয়া সময় কাটাইয়া দিলাম। তখন

বুঝি নাই, কিন্তু পরে শুনিয়াছি ঠাকুরমাই মতলব করিয়া অনিমাকে সব সময় আমার কাছে পাঠাইয়া দিতেন। আমি যখনই ঘরে বসিয়া কিছু লিখিতাম, অমনই অনিমা আসিয়া আমার পাশে বসিত। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সে গল্প করিতে করিতে আমার পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িত। আমি সেই ঘুমন্ত ছবির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম।

এই তিন মাসের মধ্যে চন্দ্রবাবু আমার কোন সন্ধান লন নাই। ঠাকুরমা প্রায়ই বলিতেন, "ওরে বোকা তেলে জলে কি মিশ খায়!" সেই কথাই আমার কেবলই মনে পড়িত। আবার এক একবার ভাবিতাম, লাট-কাউন্‌সিলের মেম্বর হইয়া তাঁহার বোধ হয় কাজ খুব বাড়িয়া গিয়াছে, তাই আমার সন্ধান লইতে পারেন না। সেই সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের কথা মনে পড়িত—সে ত পরীক্ষার পড়া কামাই করিয়াও দুই বেলা আমার খোঁজ লইয়া যায়! চন্দ্রবাবু বড়লোক, আমি গরীব—কিছুতেই তাঁহার সঙ্গে মিল হইতে পারে না। তবুও চন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্যে মনটা কেমন উতলা হইত। তাঁহার দুটো মুখের কথা শুনিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইতাম। এক একদিন এমন অস্থির হইয়া পড়িতাম, যে হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁহার বাড়ীর ফটকের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইতাম, কিন্তু কোন দিন

ফটক পার হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই ; ব্যথিত অন্তরে ফিরিয়া আসিয়াছি।

একদিন হঠাৎ চন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাতের সুযোগ উপস্থিত হইল। আমার কোনও এক আত্মীয়ের পুত্রের সহিত চন্দ্রবাবুর ভগিনীর কন্যার বিবাহে আমি নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলাম। পত্রে দেখিলাম, বিবাহ চন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই হইবে। আমার আর আহ্লাদ ধরে না। সাজিয়া-গুজিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বরের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাত্রি প্রায় আটটার সময় চন্দ্রবাবুর গৃহে গিয়া পৌঁছিলাম। অল্প কিছুক্ষণ পরেই হলঘরে চন্দ্রবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তখন আর একজনের সহিত গল্প করিতেছিলেন, আমি এমন জায়গায় দাঁড়াইলাম যে, চন্দ্রবাবু মুখ তুলিলেই আমাকে দেখিতে পান। তিনি গল্প করিতে করিতে মাঝে মাঝে আমার দিকে চাহিলেন কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। আমি অন্তরে আঘাত পাইলাম। পরক্ষণেই মনে হইল, চন্দ্রবাবু বোধ হয় ভদ্রলোকটির সঙ্গে বিশেষ কোন কাজের কথা বলিতেছেন, তাই এদিকে তাঁহার খেয়াল নাই! চন্দ্রবাবুর কথা শেষ হইয়া গেল, তিনি আমার দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে আমি, নিঃশ্বাস প্রায় রুদ্ধ করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে চন্দ্রবাবু

আপনি ভাল আছেন? অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি।”

চন্দ্রনাথবাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া বাক্যব্যয় না করিয়া অপর কক্ষে চলিয়া গেলেন। আমি কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই সেই বন্ধু, বড়-লোক বন্ধু—যাহার উপকার করিতে গিয়া আমার চাকুরী গিয়াছে—তবুও আমি এতটুকু অনুতপ্ত হই নাই! ভাবিয়াছিলাম বন্ধুর উপকার করিতে গেলে এরূপ সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিলে দুঃখ কিসের! চাকুরী একটা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু পাওয়া দুষ্কর! আঘাতটা যখন প্রচণ্ড হয়, তখন যন্ত্রণার অনুভূতিও স্তব্ধ হইয়া যায়। আমারও ঠিক তাহাই হইল! আহারে বসিয়া আমি খাদ্যদ্রব্যগুলি লইয়া কেবলই নাড়াচাড়া করিলাম, কিছু খাইতে পারিলাম না।

চন্দ্রবাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গৃহে না ফিরিয়া বিশ্বেশ্বরের বাটী গিয়া উঠিলাম। বিশু তাহার ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া পড়িতেছিল, আমি জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিলাম, “বিশু!”

বিশ্বেশ্বর আমার ব্যথিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া ব্যগ্র

কণ্ঠে কহিল, “কি হয়েছে রে সুরেশ ?” আমি সত্যই কাঁদিয়া ফেলিলাম। বিশু শঙ্কিত হইয়া আমার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “সবাই ভাল আছে ত রে ?” কি সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর !

আমি কহিলাম, “ভাল আছে বৈ কি।”

বিশ্বেশ্বর আশ্বস্ত হইয়া কহিল, “তবে কাঁদছিলি কেন ?”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “তোর জন্যে ভারি মন কেমন করছিল।”

বিশ্বেশ্বর নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সেই স্নিগ্ধদৃষ্টির প্রলেপে আমার অন্তরের সমস্ত বেদনা দূর হইয়া গেল।

আমি বলিলাম, “তা হ’লে চললাম ভাই, অনেক রাত হয়েছে।”

বিশু আমায় খানিকদূর আগাইয়া দিয়া গেল।

বাড়ী গিয়া ঠাকুরমাকে বলিলাম, “ঠাকুরমা খুব শিক্ষা হয়েছে।”

ঠাকুরমা বলিলেন, “কার রে ? কি শিক্ষা হল ?”

হঠাৎ কি মনে হইল, যাহা বলিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা চাপিয়া গেলাম ; হাসিয়া কহিলাম, “কার আবার, ও কিছু নয়।”

ঠাকুরমাও আর কিছু বলিলেন না। আমি উপরের ঘরে দিয়া দেখিলাম, অনিমা অৰ্দ্ধশায়িত অবস্থায়, কি একখানা বই পড়িতেছে। আমার পদশব্দে সে ক্ষিপ্রহস্তে বসন সংযত করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, "এত রাত্তির হল! আমি কখন খেয়েদেয়ে তোমার জন্যে বসে আছি। বড়লোকের বাড়ী কেমন খাওয়ালে গো?"

আমি বলিলাম, "বড়লোকের বাড়ী যেমন খাওয়ায়, তেমনি খাইয়েছে।"

অনিমা কহিল, "চন্দ্রবাবু এতদিন তোমার খোঁজ খবর নেন নি কেন, কিছু বললেন না?"

আমি বলিলাম, "যে ভিড়!"

অনিমা কহিল, "তোমার সঙ্গে চন্দ্রবাবুর বুঝি কোন কথা হয় নি?"

আমি সংক্ষেপে কহিলাম, "না।" চন্দ্রবাবুর নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা আমি অনিমাকেও বলিতে পারিলাম না! পারিলে ভালই করিতাম।

পরদিন হইতে আমি চাকুরীর জন্য উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করিতে লাগিলাম। দুই তিন জায়গায় ভরসা পাইলাম। কেহ বলিল, "দিন পনের পরে আসবেন, একটা চাকরী খালি হবে।" কেহ বলিল, "ইংরেজী মাসের

মাঝামাঝি আসবেন দেখা যাবে।" একজন কহিলেন, "পনর তারিখে আসবেন! সেদিন আপনার যাহ'ক একটা কিছু করেই দেব।" আমি মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলাম, আর বড়লোকের সঙ্গে মিশিব না, তাহাদের কোন উপকার করিয়া কাজ নাই।

যেদিন চাকুরী হইবার কথা, তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে চন্দ্রকান্তবাবু স্বয়ং আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। আমি তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলাম। যাদুকর—যাদুকর! একবার আমার মুখের দিকে চাহিতেই আমি কেমন একরকম হইয়া গেলাম! তিনি আবার আমার হাত ধরিলেন। আমি সত্যই কাঁপিতে লাগিলাম।

চন্দ্রকান্তবাবু আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলেন কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, "এতদিন কাজের ভিড়ে আপনার খবর নিতে পারি নি, তাই মাপ চাইতে এসেছি। মাপ করবেন ত সুরেশবাবু?"

পুরুষ নারীর প্রেমে মজে, আমি বড়লোকের মোহে মজিলাম। এত অপমান, এত ঘৃণা, এক মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া গেলাম। আমি জোড়-হাত করিয়া কহিলাম,

"আপনি কেন মাপ চেয়ে আমায় লজ্জা দিচ্ছেন। আমারও ত একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল, তা পেরে উঠি নি।" এখানে একটা বড় রকমের মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলাম। আমি যে তাঁহার বাড়ীর দরজা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি, সে কথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলাম না।

তিনি বলিলেন, "দেখুন, সেদিন আমার এক ভাগ্নীর বিয়ের বরযাত্রীদের মধ্যে যেন আপনাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে? সেদিন আমি ঠিক ঠাওরাতে পারি নি।"

যেদিন আমি ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়াছিলাম, সেই দিনের কথা! আমি অন্তরের মধ্যে বিশেষ লজ্জা অনুভব করিলাম। মনে মনে বলিলাম, 'আমি অত্যন্ত ভাব-প্রবণ, একটুতেই বিচলিত হয়ে পড়ি! চন্দ্রবাবুর কোন দোষ নেই; দোষ ত আমারই! আমি কেন তাঁর কাছে সেদিন ভাল ক'রে নিজের পরিচয় দিলাম না।'

চন্দ্রবাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সেবার আপনি আমার যে উপকার করেছেন, এরকম উপকার বড় কেউ করে না। আপনার উদারতায় আমি মুগ্ধ!"

আমার সারা দেহের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল!

তার পর তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাহার মধ্যে যেটি কাজের কথা তাহারই উল্লেখ করিব।

তিনি আমায় বলিলেন, "দেখুন সুরেশবাবু, আমি একখানা বই বার করব স্থির করেছি। তার লেখার ভার আপনার ওপর।"

আমি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলাম, "যে আজ্ঞে।" কিন্তু মনে মনে বলিলাম, "শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর।" আমার বিদ্যার দৌড় যে কতদূর, তাহা অন্যের নিকট গোপন থাকিলেও, নিজের কাছে গোপন থাকে না। দুই তিনখানি মাসিক পত্রিকায় আমার নাম স্বাক্ষরিত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধাদি বাহির হওয়ায় আমি পাঁচজনের কাছে জাহির হইয়াছি সত্য ; কিন্তু সেগুলির ভিতর কয়টি লাইন আমার নিজের লেখা, তাহা ত কাহারও জানিবার উপায় নাই ; এমন কি প্রবীণ সম্পাদকগণের পর্য্যন্ত নহে। আমি দুই ছত্র লিখিয়া বিশ্বেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইতাম, সে নিজের পড়ার ক্ষতি করিয়া নূতন করিয়া লিখিয়া দিত। আমি তাহার লেখার মধ্যে নিজের দুই এক ছত্রও গুঁজিয়া দিতাম—অবশ্য তাহাকে দেখাইয়া ; সে হাসিয়া বলিত, 'বেশ হয়েছে'। আমি কিন্তু মনে মনে বলিতাম, 'বেশ যা হয়েছে তা আমি খুব বুঝি।' আমি একদিন বিশ্বেশ্বরকে

বলিলাম, "দেখ্‌ ভাই বিশু, এ জুচ্চুরি করতে আর ইচ্ছে হয় না। অমন নামে আমার কাজ নেই। এবার আমি সত্য কথা প্রকাশ করে দেব।"

বিশু ধমক দিয়া বলিল, "খবরদার।"

পরক্ষণেই ভাবিলাম, চারিদিকে বেশ নাম পড়িয়া যাইতেছে, মন্দ কি! সম্পাদকেরা খাতির করিতেছেন, বাহিরের লোক বাহবা দিতেছে, মূর্খ প্রকাশকেরা খোসামোদ করিতেছে! আমার তখনই মনে হইল, শুধু যে আমিই এ কাজ করি, তাহা নহে। কত লোকই ত এ ব্যবসা চালাইতেছে। কত লোক পরকে দিয়া নিজের লেখা দেখাইয়া লইতে গিয়া সম্পূর্ণ নূতনভাবে লিখাইয়া লইয়া বেমালুম নিজের নামে বাজারে বই চালাইয়া দিতেছেন—যিনি কষ্ট করিয়া পুস্তকখানি আগাগোড়া লিখিয়া দিলেন, পুস্তকের কোথাও তাঁহাকে এতটুকু কৃতজ্ঞতা জানানও স্বনামধন্য গ্রন্থকার প্রয়োজন মনে করেন না! যাহারা তাসের ঘরে বাস করে, তাহাদের যে প্রতিমুহূর্ত্তেই আশঙ্কা—বুঝি তাহাদের ঘর পড়িয়া গেল! এই শ্রেণীর গ্রন্থকারেরা বোধ হয় মনে করেন, কৃতজ্ঞতা জানাইয়া যদি কাহারও নামোল্লেখ করি, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! বিশ্বাস কি, যদি কোন রকমে আসল

কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে! কিন্তু হায়রে মূর্খের দল, তাহারা জানে না যে, তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টাসত্ত্বেও তাসের ঘর বেশীক্ষণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না, সে ঘর অচিরাৎ ভূমিসাৎ হইবেই! এমনও দুই একজনকে আমি দেখিয়াছি, যাহাদের চরিত্র আরও ভীষণ! যিনি তাহাকে হাতে ধরিয়া লেখা শিখাইয়াছেন, যিনি নিজে লিখিয়া সাহিত্যবাজারে তাহার নাম জাহির করিয়াছেন, সুবিধা বুঝিয়া সেই ব্যক্তিকে ঐ নকল-গ্রন্থকার মূর্খ প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা প্রকার ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করে নাই! আমি কিন্তু এখনও এতদূর উন্নত হই নাই। তবে ভবিষ্যতে যে কি হইব, তাহা এখন জোর করিয়া বলিতে পারি না।

চন্দ্রবাবুর সহিত এবার পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা হইয়া গেল। অর্থের কথা উঠিতেই প্রথমে আমি কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, লিখিয়া পয়সা পাইব ইহা ত সৌভাগ্যের কথা—এ ত আর পরের গোলামী করা নয়!

চন্দ্রবাবু বলিলেন, "দেখুন সুরেশ বাবু, আপাততঃ পারিশ্রমিকস্বরূপ আমি বেশী কিছু দিতে পারব না। চারিদিকে নানা রকম খরচপত্র; আপনাকে মাসিক ২৫৲ করে দেব।"

আমি বিস্মিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "যথেষ্ট !" মনে করিয়াছিলাম খুব বেশী দেয় ত, মাসে দশটা—একেবারে পঁচিশ টাকা !

চন্দ্রবাবু চলিয়া গেলে, আমি ঠাকুরমার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলাম, "ঠাকুরমা চাকরী হয়েছে, এবারে চাকরী বড় ভাল, ঘরে বসে কাজ, অথচ মাইনে সেই পঁচিশ টাকা !"

ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি রকম চাকরী ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমরা ঠাকুরমা তা বুঝতে পারবে না !" এই বলিয়া আমি সমস্ত কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলাম।

তিনি গালে হাত দিয়া কহিলেন, "ও আমার পোড়া কপাল, এই কাজ ! এই ত সেদিন চন্দ্রবাবুর বাড়ী থেকে অপমান হয়ে ফিরে এলি, আবার তার সঙ্গে জুটলি কি করে !"

আমি অবাক্ হইয়া ঠাকুরমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সেদিনকার অপমানের কথা ত কেহই জানে না ! ঠাকুরমা কি অন্তর্য্যামী ! আমি মনের চাঞ্চল্য যথাসম্ভব গোপন করিয়া কহিলাম, "আমি জুটতে যাব কেন

ঠাকুরমা—চন্দ্রবাবু নিজে এসে আমায় কত সাধাসাধি করে গেছেন, তবে ত আমি রাজি হয়েছি। ঘরে বসে পঁচিশ টাকা ক'জনের ভাগ্যে জোটে!" অনিমা ঠাকুরমার একপাশে দাঁড়াইয়াছিল, একবার সগর্ব্বে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে মৃদু হাসির মধ্য দিয়া তাহার অন্তরের আনন্দ প্রকাশ করিল।

ঠাকুরমা হাসিয়া কহিলেন, "ওরে সুরো কথাটা ভুলিস নি,—কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "দেখা যাক্, কি হয়।" এই বলিয়া আমি বিশ্বেশ্বরের সন্ধানে চলিয়া গেলাম। সে-ই-ত আমার কর্ণধার!

[৫]

কাজ চলিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বর পড়ার ক্ষতি করিয়া চন্দ্রবাবুর পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী করিয়া দিত, আমি অতি যত্ন করিয়া তাহা নকল করিতাম এবং সময়-মত চন্দ্রবাবুর বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতাম। মাঝে মাঝে চন্দ্রবাবুর সহিত আমার দেখা হইত, তিনি হাসিয়া দুই একটি মিষ্ট কথায় আমায় তুষ্ট করিতেন। আমি সেদিন আনন্দে বিহ্বল হইয়া গৃহে ফিরিতাম।

এমনই করিয়া প্রায় দেড় মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক প্রাপ্তির কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। চন্দ্রবাবুও সে বিষয়ে কোন কথা বলেন না, আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারি না। এমনই অবস্থায় আরও সাত দিন কাটিয়া গেল। শেষে ঠাকুরমার বিদ্রূপ-বাণে জর্জ্জরিত এবং অনিমার প্রশ্নের পর প্রশ্নে অস্থির হইয়া লজ্জার মাথা খাইয়া একদিন চন্দ্রবাবুকে বলিলাম, "আজ্ঞে আমার পারিশ্রমিক—"

তিনি আমায় কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে কি,—আপনি এখনও পান নি! সরকার বাবুকে ত বলে দিয়েছি ; আপনি চাইলেই পাবেন।"

আমি বলিলাম, "যে আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না।"

তার পর সরকারমহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। বড়লোকের কর্ম্মচারী, তাহাতে আবার তহবিলভার-প্রাপ্ত—সে এক অদ্ভুত জীব! যদি বা কখনও বাবুর হাত হইতে টাকা বাহির করা যায়, কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম-চারীর হাত হইতে টাকা বাহির করা, সে এক অসাধ্য-সাধন ব্যাপার। তখন মনে হইত, এই সব অবিনয়ী, কর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন কর্ম্মচারীদের জন্যই অনেক বড়লোকের নামে মিথ্যা অপবাদ রটে। লোকে বলে, অনেক

বড়লোকের কাছ হইতে পাওনা টাকা আদায় করা অত্যন্ত দুরূহ ; আমি ভাবিতাম তাহাদের ধারণা ভ্রান্ত—বড়লোকের কোন দোষ নাই, যত দোষ ঐ তাঁহার লোকজনের! বাবু ত তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ দুর্বৃত্ত লোকজনেরা তাঁহার হুকুম তামিল করে না। স্পর্দ্ধা ত কম নয়! কিন্তু ক্রমার্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিলাম, কর্ম্মচারীরা অন্তর্টিপ্পনী না থাইলে এ কাজ করিতে পারে না।

আমি সরকারমহাশয়ের নিকট প্রতিদিনই হাঁটিতে লাগিলাম। ক্ষোভে অপমানে আমার মাথা হেঁট হইল! আমি যে চন্দ্রবাবুর বন্ধু, আমি ত তাঁহার বেতনভোগী চাকর নই, যে টাকার জন্য একজন নগণ্য সরকারের খোষামোদ করিব। কিন্তু মনে মনে যতই আস্ফালন করি না কেন কাজে আমাকে সেই সরকারমহাশয়ের মুখ চাহিয়াই থাকিতে হইল। ক্রমান্বয়ে সাত দিন হাঁটিবার পর সরকারমহাশয় আমায় দশটি টাকা দিতে আসিলেন।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "দশ টাকা কি মশায়, আমি গত মাসের দরুণ পঁচিশ টাকা পাব, তা ছাড়া আর এক মাসও ত হয়ে এল।"

সরকারমহাশয় আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে

হাসিতে বলিলেন, "জমিদারবাড়ীতে এই বুঝি আপনার প্রথম চাকরী ?"

আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি চাকর! মুণী সরকার বোধ হয় জানে না, চন্দ্রবাবুর সহিত আমার কি সম্পর্ক! কি করিয়াই বা জানিবে! সে হয় ত কেবলই দেখিয়াছে এখানে যাহারা যাতায়াত করে, তাহাদের অধিকাংশই মোসাহেব বা প্রার্থী। সে আমার কদর কি করিয়া বুঝিবে।

আমি যে মোসাহেব ছাড়া আর কিছু নয়—এ সত্যটা তখন আমি কিছুতেই অন্তরের মধ্যে স্বীকার করিতে পারি নাই, বাহিরে তাহা স্বীকার করা ত আমার পক্ষে অসম্ভব। শুধু আমারই বা বলি কেন, অন্তরের মধ্যে বুঝিলেও কয়জনই বা বাহিরে সে কথা স্বীকার করে? আমি এমন দু'তিন জনকে দেখিয়াছি, যাহারা মোসাহেবী করিয়া বেশ দু'-পয়সা রোজগার করিয়া থাকে, অথচ তাহাদের যদি কেহ মোসাহেব বলে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই,—তাহারা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিবে, "মোসাহেব-গুষ্টির আমরা পিণ্ড দিই,—যে আমাদের মোসাহেব বলে, তাদের মুখে
ইত্যাদি ইত্যাদি অকথ্য কুকথ্য ভাষায় ভদ্রলোকের

আত্মশ্রাদ্ধ করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মোসাহেবীই পেশা। কিন্তু সত্য বলিতে গেলে, আমি তখনও মোসাহেব হইয়া উঠি নাই। কারণ মোসাহেবগণের যে সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সব লক্ষণ তখনও আমাতে বর্ত্তায় নাই।

আগে শুনিতাম, রাজারাজড়ারই মোসাহেব থাকে, এখন দেখিতেছি আমাদের এই সাহিত্যের হাটে সম্পাদকের, প্রকাশকের, সমালোচকেরও দু'তিনটি করিয়া মোসাহেব থাকে। মোসাহেবগণ চারিদিকে তাঁহাদের গুণগান করিয়া বেড়ায়, তাঁহারাও তাহার অসার প্রবন্ধ ছাপাইয়া, বাজে বই প্রকাশ করিয়া, সমালোচনার ডঙ্কা বাজাইয়া তাহাকে প্রচার করেন। তবে সাধারণ মোসাহেব ও সাহিত্যিক মোসাহেবে বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রথম দলের মোসাহেবরা সর্ব্বসমক্ষে মোসাহেব বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকে; কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করে না; যদি তাহাদের কেহ মোসাহেব বলে, তাহা হইলে মৃদু হাসিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মোসাহেবেরা লুকাইয়া সেই মোসাহেবী করিবে, অথচ কেহ তাহাদের মোসাহেব বলিলে তাহারা তাহা সহ্য করিতে পারে না। উত্তরে নানারূপ বেতাল

বকিয়া নিজেদের পাঁচজনের কাছে হাস্যাস্পদ করিয়া তোলে।

মো-সাহেব সম্বন্ধে এতগুলো অবান্তর কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, কেন না আমি চন্দ্রকান্তবাবুর বন্ধু সাজিতে গিয়া ক্রমে ক্রমে মো-সাহেব-দলভুক্ত হইয়া যাইতেছিলাম।

যাক্ এখন সরকারমহাশয়ের সঙ্গে কি কথা হইল, তাহাই আরম্ভ করি।

সরকারমহাশয় আমাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া আবার কহিলেন, "জমিদারবাড়ী ত চাকরবাকরেরা ছ'মাস অন্তর মাহিনা পায়—আপনার ত মশায় ভাগ্যি ভাল যে একমাস শেষ হতে না হতেই এক সঙ্গে দশ টাকা পাচ্ছেন।"

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "আমি ত মশায় আপনার বাবুর চাকরবাকরের দলের একজন নয় যে আপনি আমায় ওসব কথা শোনাচ্ছেন। আমার মাসকাবারি মাইনে নয়, লেখার মূল্য। আমি এক সঙ্গে পঁচিশ টাকা চাই।" আমি যে তখন কি করিয়া মানুষের মত দুটো কথা বলিয়াছিলাম, তাহা আমি এখন ভাবিয়া পাই না। তার পর দশ টাকা আমি কিছুতেই লইতে পারি না—ঠাকুরমার

কাছে তাহা হইলে আর মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিব না।

সরকারমহাশয় গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আপনি বাবুর কাছে লিখিয়ে আনবেন, আমি অত কথা শুনতে বাধ্য নই।"

আমি সেদিন মর্ম্মাহত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। ইহার অপেক্ষা যে আমার সওদাগরী-আপিসের চাকুরী অনেক ভাল ছিল! সেখানে মাসটি শেষ হলেই পয়লা তারিখে মাহিনা পাইতাম। সারা মাসের লাঞ্ছনা এই একটী হজমি গুলিতেই পরিপাক হইয়া যাইত! এ যে বিষম ব্যাপার—জাতও যায় অথচ পেটও ভরে না।

অগত্যা দিন দুই পরে চন্দ্রবাবুকে সে কথা জানাইতেই তিনি যেন সঙ্কোচের ভাব দেখাইয়া বলিলেন "মশায় মাপ করবেন—চাকরবাকর সব ওই রকমের!" আমি একেবারে গলিয়া গেলাম! তিনি আমার কহিলেন,"আমি লিখে দিচ্ছি।" কিন্তু সেই দুটো কথা লিখিতে তাঁহার দীর্ঘ সাতদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। যাহা হউক প্রায় আড়াই মাস কাজ করিবার পর আমি পঁচিশ টাকা হস্তগত করিলাম।

আমার দোষই বলুন,আর গুণই বলুন, আমি খোসামোদ করিতে তেমন অভ্যস্ত হই নাই। হইতে পারিলে এই

পঁচিশ টাকা আদায় করিতে আমায় এত পরিশ্রম করিতে হইত না। আমারই সামনে কত লোক তাক্ বুঝিয়া কথা বলিয়া এমন কত পঁচিশ টাকা বাহির করিয়া লইয়াছে। অথচ প্রকৃত কোন দুঃখী সারাদিন কান্নাকাটি করিয়াও বাবুর নিকট হইতে একটি পয়সা বাহির করিতে পারে নাই।

হায়রে চাটুকার, তোমাদের কি অসীম শক্তি! তোমরা কত বড় বড় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে একেবারে ভেড়া বানাইয়া রাখ। তোমাদের চাটুবাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা তোমাদের কোন দোষই দেখিতে পান না। লোকে যে তাঁহাদের দেখিয়া হাসে, তাঁহাদের নামে কত অপবাদ দেয়, তাহা দেখিবার বা বুঝিবার মত সামান্য শক্তিটুকু অবধি তাঁহাদের লোপ পায়। কিন্তু তাঁহাদেরই বা দোষ দিই কি করিয়া—কেন না আমাদের দেশে কথাই আছে—"খোসামোদে ভগবান তুষ্ট;" তাঁহারা ত সামান্য মানুষমাত্র! তবে খোসামোদে ভগবান আত্মবিস্মৃত হন কি না সে কথা ত জানা যায় না। কাজেই যাহা চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি, তাহা ত কিছুতেই অবিশ্বাস করিতে পারি না। এমন দেখিয়াছি, চাটুবাক্যে মুগ্ধ মনীষিগণ পঙ্গুকে দিয়া সাগর লঙ্ঘন করিবার এবং

বামনকে দিয়া চাঁদ ধরাইবার ব্যবস্থা করিয়া মহাকবির বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এমনও শুনিয়াছি সাহিত্য-ধুরন্ধরেরা চাটুকারদের কাহাকে বা মহাকবি কালিদাস হইতে শ্রেষ্ঠ, কাহাকে বা গল্পরাজ্যে মোপাসা ও ব্যালজ্যাকেরও উপর বলিয়া সার্টিফিকেট প্রদান করেন। নিঃসঙ্কোচে লিখিয়া দেন,—'তোমার কবিতা পড়িতে পড়িতে ভুলিয়া যাই, আমি এ কাহার লেখা পড়িতেছি, তোমার না কালিদাসের';—'তোমার গল্প পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন ফরাসী রাজ্যে বসিয়া ব্যালজ্যাকের গল্পই পড়িতেছি।" হায়রে, এই বিদ্যা যদি তখন আয়ত্ত করিতে পারিতাম!

[৬]

চন্দ্রবাবুর সহিত মিশিতে মিশিতে আমি বুঝিলাম এ ভাবে চলিলে লোকে আমায় মোসাহেব ছাড়া অন্য কিছু বলিবে না। তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম চন্দ্রবাবুর সহিত ঠিক সমানভাবে চলিতে হইবে। এবার যখন পঁচিশ টাকা পাইলাম, তাহার এক পয়সাও বাড়ীতে দিলাম না। চন্দ্রবাবু যে দোকানে জামা তৈয়ারী করেন, সোজা সেই দোকানে উপস্থিত হইয়া টাকা জমা দিয়া

আসিলাম। চন্দ্রবাবুর নাম করিয়া ঐ পঁচিশ টাকায় একশত টাকার জামা ক্রয় করিলাম।

জুতার জন্য ঠাকুর্দ্দাকে গিয়া ধরিয়া বসিলাম; বলিলাম, "ঠাকুর্দ্দা আমায় এক জোড়া ভাল জুতো কিনে দিতে হবে।"

ঠাকুর্দ্দা আমার কোনদিনই বেশী কথা বলিতেন না। তিনি কখনও আমার কোন আবদার পূরণ করিতে এতটুকু বিলম্ব করিতেন না। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কত লাগবে?"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "টাকা বার তের।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "বেশ।" বলিয়া বাক্স হইতে তখনই তের টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

ঠাকুরমা কোথায় ছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "তুমি এসব করছ কি, আমরা কোথায় ওর ভূত ছাড়াবার চেষ্টা করছি, আর তুমি সব মাটি করতে বসেছ?"

ঠাকুর্দ্দা শুধু হাসিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

আমি ঠাকুরমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলাম। টাকা কি কাহারও সঙ্গে যাইবে! ঠাকুরমার এ কি' অন্যায় কথা, যখন

তখন একজন মানী ব্যক্তিকে কি না ভূত বলিয়া বিদ্রূপ করা! যদি কেহ শোনে!

বৈকালে বিশ্বেশ্বর আসিয়া কহিল, "এসব কি করছিস সুরো, চন্দ্রবাবুর সঙ্গে সমানে চলতে গেলে যে মারা যাবি। ভিটেটুকু অবধি থাকবে না।"

আমার আর সহ্য হইতেছিল না। যে দেখিবে, সেই আমায় রূঢ় কথা বলিবে! কেন আমি করিয়াছি কি?

আমি রাগিয়া কহিলাম "কেন তোমার হিংসে হচ্ছে না কি?"

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল "তুই সত্যিই পাগল হয়েছিস।"

রাত্রে শুইতে আসিয়া অনিমা কহিল, "আমায় জোড়া দুই কাপড় এনে দাও। এ ছেঁড়া কাপড় আর পরতে পারছি না।"

আমি অত্যন্ত রাগিয়া কহিলাম, "বিশুর মত তোমারও বুঝি হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে। দুটো জামা কিনেছি আর অমনই তোমার নতুন কাপড় না হলে চল্ল না!"

অনিমা বাষ্পাকুলকণ্ঠে কহিল, "বেশ আর চাইব না। দেখ দেখি আমার কাপড়ের দিকে চেয়ে।"

আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাহিয়া দেখিলাম—কাপড়খানির অন্তত দশ জায়গায় ছেঁড়া: তাহাতে কোন রকমে

লজ্জা নিবারণ করা চলে। ইহা ষড়যন্ত্র, ঠাকুরমার চক্রান্ত! কিন্তু কোন ফল হইল না; আমি একবার ভাবিয়াও দেখিলাম না, কি করিয়া সংসার চলিতেছে। অনিমার উপর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাগ হইল। সে আমার স্ত্রী হইয়া কি না আমার বিরুদ্ধে চক্রান্তে যোগদান করিয়াছে। আমি রাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম এবং সে রাত্রির মত বৈঠকখানা ঘরেই শুইয়া রহিলাম। অনিমা সারারাত্রি মেঝের উপর পড়িয়া কাঁদিয়াছে; ঠাকুরমার কাছে গিয়া নালিশ করে নাই। নালিশ করিলে ঠাকুরমা আমায় নিশ্চয় ধরিয়া আনিতেন। তিনি আমার রাগ একেবারেই গ্রাহ্য করিতেন না।

বাড়ীতে আমি ক্রমে একটা মূর্ত্তিমান্ অশান্তি হইয়া দাঁড়াইলাম। কোন-কিছুই আমার পছন্দ হয় না, খাওয়া শোয়া, বসা কিছুই আমার পছন্দ হয় না। খাইতে বসিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতাম, শুইতে গিয়া শয্যার দীনতা দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিতাম, বাহিরের ঘরে বসিতে গিয়া হতাশ হইয়া পড়িতাম! এ ঘরে মানুষ বসে কি করিয়া। তাই ঐ বাহিরের ঘরটী প্রতিদিনই নূতন করিয়া সাজাইতাম; কেন না একবার সাজান আমার মনোমত হইত না। বেচারী অনিমারই শুধু কষ্টের একশেষ হইত, দিনের মধ্যে

পাঁচবার করিয়া তাহাকে সেই ঘরটি ঝাঁট দিতে হইত। উপরের শোয়ার ঘর হইতে আমার পুস্তকাদি টানিয়া আনিয়া তাহাকে বাহিরের ঘরে সাজাইতে হইত। একটু ত্রুটি হইলে কিম্বা ত্রুটি কল্পনা করিয়াই আমি তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতাম। সে নীরবে আমার সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিত। তবে এই অত্যাচারের জন্য ঠাকুরমার কাছে আমি প্রায় প্রতিদিনই কানমলা খাইতাম, সস্নেহ ভৎর্সনার ত অন্ত ছিল না।

একদিন রাত্রে বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি। এমন সময় ভিতরে বিশ্বেশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। ঠাকুরমা বোধ হয় কি বলিতেছিলেন, তাহারই উত্তরে বিশ্বেশ্বর বলিল "তাই করতে হবে। তাতেও যদি তার হুঁস না হয়, তখন অন্য উপায় করা যাবে।"

ঠাকুরমার কণ্ঠস্বর আমার কাণে গেল। কি বেদনা-পূর্ণ সে কণ্ঠস্বর! ঠাকুরমাকে ত আমি কোনদিন এরূপ ব্যথিতকণ্ঠে কথা বলিতে শুনি নাই। আমার মনের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। কি অব্যক্ত বেদনায় আমার সারা অন্তর ভরিয়া গেল।

ঠাকুরমা বলিলেন, "বিশু আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর, তুই সুরোর ওপর কখনও রাগ করবি নি?"

বিশু গাঢ়স্বরে কহিল, "ঠাকুরমা আমি সুরোর ওপর রাগ করব! সে যদি গালাগালি দেয়, মারে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, তবু আমি তার ওপর রাগ করতে পারি না। কি শপথ করব বল ঠাকুরমা?"

ঠাকুরমা তাঁহার স্বাভাবিক স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "নারে বিশু তোকে আর শপথ করতে হবে না।"

আমি অন্যমনস্কভাবে প্রায় এক ঘণ্টা সেই ঘরে বসিয়া রহিলাম। মনের ভিতর আমার শান্তি ছিল না। যেন কিসের অতৃপ্ত বাসনা অহরহ আমার মনের মধ্যে গুমরিয়া উঠিত!

কয়দিন ধরিয়া একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম। চন্দ্রবাবুর যে তিন চারিজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, চন্দ্রবাবুর মত তাঁহাদের কাহারও মুখে গোপ দাঁড়ি ছিল না। আমার মনে হইল, চন্দ্রবাবুর সহিত সমানভাবে মিশিবার পক্ষে এই আমার স্নেহ সযত্নবর্দ্ধিত গোঁপদাড়িই প্রধান অন্তরায়। ইহার নির্ম্মূল করাই প্রয়োজন! দিন দুই ভাবিলাম। আমার মুখখানির যাহা-কিছু সৌন্দর্য্য এই গোঁপদাড়ির উপরেই যে নির্ভর করিত! হায়রে বড়লোক সাজিবার মোহ! এ ত সামান্য গোঁপদাড়ি, এই মোহের আগুনে হৃদয়ের সমস্ত সুকোমল বৃত্তিগুলি যে

একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়! কয়জন তাহা দেখিতে পায়, ক'জনেই বা তাহার সন্ধান লয়। চন্দ্রবাবুর সমকক্ষ হওয়া চাই, চন্দ্রবাবুর হৃদয়দুর্গ অধিকার করিতেই হইবে। আমার মন বলিল, বীরের মত অগ্রসর হও, প্রাণকে কঠিন কর, তোমার অগ্রগমনের পথে যে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে নির্ম্মমভাবে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া সম্মুখে ধাবিত হও; কোন দিকে চাহিও না; বিচার করিতে যাইও না, তাহা হইলে অগ্রসর হইতে পারিবে না—হয় যেখানে আছ, সেইখানেই থাকিবে, না হয় একেবারে পিছাইয়া পড়িবে।

আমি আর কালবিলম্ব করিলাম না। পরদিনই ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মুখখানিকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। ওরে আমার বন্ধুত্বের পথের প্রধান অন্তরায়, এই-বার! তার পর বাবরিচুলের পরিবর্ত্তে মাথার সম্মুখে ছয় আঙ্গুল দীর্ঘ কেশগুচ্ছ এবং পিছনের দিকে কোন রকমে মাথার চাঙ্গড়ার উপর এক পর্দ্দা চুল রাখিলাম। বাস্, বিজয়গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত করিয়া একখানা আরসির সম্মুখে দাঁড়াইলাম। কি দুর্ব্বল আমি! চোখের জল রোধ করিতে পারিলাম না। নিজের মুখ দেখিয়া নিজেই কাঁদিয়া ফেলিলাম—মুখখানি যেন কোন্ একটা জন্তুর মুখের মত বোধ হইল!

এমন সময় ঠাকুরমা আসিয়া আমার চেহারা দেখিয়া দুই গালে হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ এ কি করিছিস্ রে!"

আমি চমকিয়া উঠিলাম! কিন্তু ঠাকুরমার উপর ভারি রাগ হইল। তিনি কেন সব বিষয়ে কথা বলিতে আসেন। চোখের জল কোন রকমে সাম্‌লাইয়া বলিলাম, "কি আবার?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তোকে সত্যিই ভূতে পেয়েছে, না হ'লে মুখখানার এমন অবস্থা করিস! না এবার সত্যিই ওষুধের ব্যবস্থা করতে হ'ল। শেষে একেবারে উন্মাদ হ'য়ে যাবি।"

আমি ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে কহিলাম, "যাও যাও ঠাকুরমা মিছে আমায় বিরক্ত কর না। তোমরা যদি সব বুঝতে তা হ'লে আমাদের আজ এ অবস্থা হ'ত না।" ঠাকুরমাকে কোন দিন আমি রূঢ় কথা বলি নাই। এই প্রথম! বুকের মধ্যে কেমন জ্বালা করিয়া উঠিল।

ঠাকুরমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি সঙের মত আরসির সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম!

দুপুর বেলা বিশু আমাদের বাড়ী আসিল। তাহাকে দেখিয়া আমি একেবারে জ্বলিয়া গেলাম। এখনই

হয় ত সে কি বলিবে! আমি তাড়াতাড়ি একখানি চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে করিলাম সে আমায় দেখিতে পাইবে না, ঠাকুরমার কাছে চলিয়া যাইবে। কিন্তু বুঝিলাম সে আমার দিকেই আসিতেছে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে দুই হাতে চাদর চাপিয়া ধরিয়া নিঃশ্বাস প্রায় রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

বিশু আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিল, "কিরে সুরো আমায় দেখে লুকোলি যে, তোর হ'য়েছে কি?" এই বলিয়া সে চাদর ধরিয়া টানিল।

আমি চাদর আরও শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া কহিলাম, "বেশ করেছি; তোর কি! ফের যদি আমায় বিরক্ত করবি ত ভাল হবে না।"

বিশু হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তোর ভয়েতে ত আমি মরে গেলাম! এখন ওঠ দেখি তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

আমি বুঝিলাম, বিশু কিছুতেই রাগিবে না। তাহা ছাড়া সে-ই আমার সমস্ত বলভরসা। সে যদি রাগ করিয়া লেখা বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে চন্দ্রবাবুর কাছেও আমার কোন প্রতিপত্তি থাকিবে না! কিন্তু এ মুখ ত তাহার কাছে দেখাইতে পারি না। সে এখনই আমার

অন্তরের গুপ্ত উদ্দেশ্য ধরিয়া ফেলিবে। তবে কতক্ষণই বা তাহার সম্মুখ হইতে লুকাইয়া থাকিব। যাহা হউক আমি সেই চাদরের ভিতর হইতে বলিলাম, "আমার সঙ্গে আবার কিসের কথা?"

বিশু কহিল, "কালকে যে প্রবন্ধ দিয়ে এলি, সেইটার সম্বন্ধে।"

আমি ভারি মুস্কিলে পড়িলাম। সে প্রবন্ধটা বিশেষ দরকারী; কালই চাই। চন্দ্রবাবু কোন্ এক সভায় পাঠ করিবেন। আমি তবুও মুখ না খুলিয়া বলিলাম, "কি বল্ না, আমি শুনছি।"

বিশু হাসিয়া কহিল, "চাদরের ভেতর থেকে চলবে না। দুটো লাইন তোকে দেখান দরকার, মুখটা খোলই না।"

তাহার হাসিতে আমার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিল। কোন দরকার নাই; কেবল আমার এই শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন মুখ দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিবার জন্যই সে এই মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়াছে! আমি খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া পড়িয়া রহিলাম। তারপর হঠাৎ মনে হইল, এত ভয় কিসের, আমার ইচ্ছা গোঁফদাঁড়ি কামাইয়াছি, তাহাতে বিশুর কি! এখন'ত বিশুর মত এমন অনেকেরই চক্ষুশূল হইতে হইবে।

হিংসা হিংসা, দারুণ হিংসা! দেখুক, দেখিয়া জ্বলুক! এই সব আলোচনার মধ্যে যে প্রবন্ধের চিন্তাও আমার মনে জাগে নাই, এ কথা আমি কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না। আমি আর কিছু না ভাবিয়া চাদর ফেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিয়া গম্ভীর মুখে কহিলাম, "দেখি সেই লাইন দুটো?"

বিশু হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "এই জন্যে বুঝি মুখ লুকান হ'য়েছিল!" পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া সে কহিল, "থাক্ আর একদিন দেখাব;" বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। আমি বাইরে বসিয়া বিশুর দুই একটা কথা শুনিয়া বুঝিলাম, ঠাকুরমার সহিত আমার সম্বন্ধেই কি পরামর্শ চলিতেছে। রাগে আমার সমস্ত শরীর গস্‌গস্ করিতে লাগিল।

[৭]

সেইদিন অপরাহ্নে একটা সাহিত্য-সভায় নিমন্ত্রণ ছিল। চন্দ্রবাবুর বাটী হইয়া সেখানে যাইবার কথা। আমি সাজিয়া প্রায় ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে চন্দ্রবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল। গোঁফ-

দাড়ির কথা যদি চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তিনি সে সম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। আমি হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এঁরা ত বিশুদের মত অবুঝ নন! এঁরা সব বোঝেন! তবুও একটু কেমন খট্‌কা লাগিয়া রহিল। মনে হইল, যেন সারাপথ তিনি আমার মুখের দিকে এক একবার ঈষৎ বঙ্কিম দৃষ্টিতে চাহিয়াছেন, আর মুখ টিপিয়া হাসিয়াছেন। আবার সেই সঙ্গে আমার মনে হইল, ও কিছু নয়!

চন্দ্রবাবুর সহিত সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বিশু ও কৃষ্ণ প্রভৃতি আমার আর তিন চারি জন পুরাতন বন্ধু দাঁড়াইয়া আছে। আমি অত্যন্ত বিস্মিত ও চমকিত হইলাম। এ ত বড়লোকের সাহিত্য-সম্মিলন, ইহারা, বিশেষতঃ বিশু, কি করিয়া এ সভায় নিমন্ত্রিত হইল! আমাকে জব্দ করিবার জন্য বোধ হয় তাহারা কোন রকমে নিমন্ত্রণ-পত্র সংগ্রহ করিয়াছে!

আমি এমনভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম যেন তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। তাহারা সকলে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল! এমন সময় চন্দ্রবাবু একখানি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন; আমিও তাহাদের সেই উচ্চ হাসিতে কর্ণপাত না

করিয়া চন্দ্রবাবুর পার্শ্বস্থিত চেয়ারখানিতে ঠিক তাঁহারই বসিবার ভঙ্গিমা অনুকরণ করিয়া বসিয়া পড়িলাম।

কৃষ্ণ আমার খুব নিকটে দাঁড়াইয়া সকৌতুককণ্ঠে কহিল, "কি হে সুরেশ—গোঁফদাড়ি কামিয়েছ যে? ঠাকুরমা মারা গেছেন না কি?"

আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে কহিলাম, "পাজি ছুঁচো।"

কৃষ্ণ কহিল, "তা ভাই অত চটছ কেন—আমি আর অন্যায় কি জিজ্ঞেস করেছি, অমন গোঁফদাড়ি, যাতে তোমার চেহারাখানা মানিয়ে রেখেছিল—"

আমি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম, "তাতে তোমার কি? আমার খুসি।"

কৃষ্ণ কহিল, "তা ত ঠিক হে সুরেশ,—তোমার ছাগল তুমি ল্যাজের দিকেই কাট আর মাথার দিকে কাট তাতে আর আমাদের কি যায় আসে বল। তবে কি জান, তোমার সঙ্গে অনেক দিনের ভাব—তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, হঠাৎ এমন রূপী-বাঁদর সাজলে যে?" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ বুকপকেট হইতে একখানি আরসি বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "আমি কি আর মিথ্যে বলছি, নিজের চেহারাখানা একবার দেখ না?"

আমি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কহিলাম, "রাস্কেল! অসভ্য,—ইয়ারকীর আর জায়গা পাও নি! যাও, সরে যাও এখান থেকে, না হ'লে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দেব।"

তার পর মনে মনে বলিতে লাগিলাম, "বেটারা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মল।"

কৃষ্ণ রাগিল না, হাসিতে হাসিতে কহিল, "এ ত তোমার মৌরসীপাট্টা-করা জায়গা নয় যে, তোমার চোখ-রাঙ্গানিতে সরে যাব; এই রইলাম দাঁড়িয়ে।"

চন্দ্রবাবু এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন, বিশু যেন কিছু জানে না, এমনই নিরীহের মত একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। চন্দ্রবাবু আমার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিলেন, "আহা আপনি চটেন কেন সুরেশ বাবু!"

আমি তাড়াতাড়ি কহিলাম, "না না মশায়, আমি রাগ করি নি, ওরা ভারি অসভ্য তাই একটু ধমকে দিলাম।"

চন্দ্রবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমিও অনেক-ক্ষণ থেকে জিজ্ঞেস করব করব মনে করছিলাম,—আপনি গোঁফদাড়িটা হঠাৎ কামালেন কেন?"

এই প্রশ্নে হঠাৎ যেন আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইহার উত্তর কি দিব? আসল কথা ত প্রকাশ করিতে পারি না। এখন উপায়?

আমায় নিরুত্তর দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়া উঠিল, "কি হে সুরেশ, এইবার ? ঠাকুরমার গঙ্গাযাত্রা বা যাহ'ক একটা কিছু বলে ফেল।"

আমি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলাম। কোন রকমে রাগ সামলাইয়া বলিলাম, "বুঝলেন আজ্ঞে চন্দ্রবাবু, আজ সকালে আহারের সময় দুধটা চুমুক দিয়ে খেতে গিয়ে—" একটু থামিয়া বার দুই কাশিয়া বলিতে আরম্ভ করিলাম, "গোঁফে দুধ লেগে গেল, তাই প্রেয়সী আমার বল্লেন, আজই গোঁফজোড়া কামিয়ে ফেল,—শেষে একটা অসুখ জন্মে যাবে! কি করি বলুন, প্রেয়সীর অনুরোধ ত আর ঠেল্‌তে পারি না।" হঠাৎ এই উত্তর দিয়া আমি মনে মনে খুব গৌরব অনুভব করিলাম। সাহিত্যিক ধরণের কি চমৎকার রসিকতাই করিয়াছি, সকলের নিশ্চয়ই তাক্ লাগিয়া গিয়াছে; কিন্তু কই, কেহই ত অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল না! চন্দ্রবাবু ছড়ি নাড়িতে নাড়িতে মৃদু হাসিতে লাগিলেন, আর সেই কৃষ্ণর দল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিশু যেন মর্ম্মাহত হইয়া গম্ভীর মুখে অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল!

কৃষ্ণ বলিয়া উঠিল, "খুব সস্তায় রসিকতা করে ফেল্লে যে সুরেশ? এত প্রেয়সী-ভক্ত কবে হ'লে হে? কৈফিয়ৎ

বুঝি বাড়ী থেকে ঠিক করে এসেছ? এত বড় মিথ্যে কথাটা না বলে সোজা বল্‌লেই পারতে, চন্দ্রবাবুর গোঁফদাড়ি নেই, কাজেই আমিও গোঁফদাড়ি কামিয়ে ফেলেছি।"

আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া কৃষ্ণের মুখের সম্মুখে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তীব্রকণ্ঠে কহিলাম, "চোপরাও অসভ্য বর্ব্বর।"

এমন সময় চন্দ্রবাবু আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আপনি ওদের কথায় রাগ কর্‌ছেন কেন? বলুক না ওদের যা ইচ্ছে। ঐ সামান্য কারণে গোঁফদাড়ি কামিয়ে না হয় একটা ভুলই করেছেন—ও ভুল আর শুধরাতে কতক্ষণ। কিছুদিন না কামালেই আবার দাড়িগোঁফ উঠে পড়বে; আপনি রাগ করেন কেন।"

চন্দ্রবাবুর এই কথায় আমার সর্ব্বশরীর জ্বালা করিয়া উঠিল। ওঁর বেলায় ঠিক হয়, আর আমার বেলা ভুল! উনি গোঁফদাড়ি কামাতে পারেন আর আমি কামালেই যত দোষ!

চন্দ্রবাবু বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "না না আপনি বেশ করেছেন।"

আমি আবার গলিয়া গেলাম! এই ত বন্ধুর মত কথা।

যাই ? এমন সময় সম্মুখে একখানি ট্রাম থামিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম। হাই-কোর্টের একখানি টিকিট কিনিয়া হাবড়া পোলের ধারে গিয়া নামিলাম।

ধীরে ধীরে পোলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কি জনতা! ডেলি-প্যাসেঞ্জারের দল হুড়াহুড়ি ঠেলা-ঠেলি করিয়া ছুটিতেছে! কাহাকেও হয় ত তিন মিনিটের জন্য তিন ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হইবে; কাহারও বা চারি মিনিটের জন্য সেদিনকার মত গৃহে ফিরিবার পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে;—পত্নী অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া ব্যাকুল হইয়া সারারাত্র বসিয়া থাকিবে,—খোকার রাত্রে ঘুম হইবে না, 'বাবা বাবা' করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিবে!

আমি ভিড়ের মধ্য দিয়া কোন রকমে পোলের উপর গিয়া পৌঁছিলাম, কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব! কাজেই ফিরিলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক জগন্নাথঘাটে বসিয়া গৃহে ফিরিবার সঙ্কল্প করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, কয়েকজন মাড়োয়ারী একজন অন্ধকে ধাক্কা মারিতে মারিতে ঘাটের বাহির করিয়া আনিতেছে। অন্ধ ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে এবং মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া কাঁদি-

তেছে, আর সেই মাড়োয়ারীর দল তাহাকে অকথ্য কুকথ্য ভাষায় গালিবর্ষণ করিতেছে। আমার অসহ্য বোধ হইল। আমি অন্ধকে আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "আপনারা কেন একে মারধর করছেন?"

তাহারা সে কথায় আরও রাগিয়া বলিল, "বেশ করছি, —বেটা মেয়েদের ঘাটে ঢুকে বসেছিল—মারব না।"

আমি বলিলাম, "দেখ্‌ছেন না অন্ধ।"

একজন মাড়োয়ারী চীৎকার করিয়া কহিল, "এ ব্যাটাকে শুদ্ধ থানায় নিয়ে চল।"

আমি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "চল।"

এমন সময় একজন মাড়োয়ারী আমার ঘাড়ে হাত দিয়া ধাক্কা মারিয়া কহিল, "চল্‌ বেটা।"

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে এক ঘুষি মারিলাম। ভীমরুলের চাকে খোঁচা মারিলে ভীমরুলের দল যেভাবে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসে,—চারিদিক হইতে মাড়োয়ারীর দল, সেইভাবে আমায় আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। অন্ধ দেখিতে না পাইলেও, অনুভূতির দ্বারা সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লইয়া আক্রমণকারীর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া লাঠি তুলিল। একজন মাড়োয়ারী ক্ষিপ্রহস্তে লাঠিটি ধরিয়া ফেলিয়া তাহাকে সজোরে এক

ধাক্কা মারিতেই সে মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। আমি তখন ক্ষিপ্তের ন্যায় সেই নিষ্ঠুর মাড়োয়ারীকে আক্রমণ করিলাম। তখন আমার মাথায়, পিঠে, কাঁধে অজস্র কিল-চড় বর্ষিত হইতে লাগিল। পাছে ভূলুণ্ঠিত অন্ধের দেহে আঘাত লাগে, এই ভয়ে আমি এক পা নড়িতে পারিলাম না, তাহাকে আগুলিয়া দাঁড়াইয়া মার খাইতে লাগিলাম। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ সহ্য করিতে পারিব! বেগতিক বুঝিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিলাম, "বন্দে মাতরম্।" দেখিতে দেখিতে চারিদিক হইতে যুবকদের দল ছুটিয়া আসিল। আমি তাহাদের দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম, "এই অন্ধটিকে আপনারা রক্ষে করুন।" আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই দেখি কাপুরুষ মাড়োয়ারীর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া যে দিকে পাইল পলায়ন করিল।

তখন সেই যুবকদের সাহায্যে অন্ধকে ধরিয়া তুলিলাম। তাহাকে সুস্থ করিয়া গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিলাম। পথে যাইতে যাইতে কেবলই মনে হইতে লাগিল, মানুষ কি করিয়া এমন নিষ্ঠুর হয়—একজন আশ্রয়হীন সঙ্গীহীন অন্ধ, তাহার দেহে আঘাত করিতেও মানুষের হাত উঠে! হায়রে সে দিন!

আমি বাড়ী ফিরিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলাম। ভিতরে বিশ্বেশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। আমি উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। যতটুকু শুনিলাম, তাহাতে বুঝিতে বাকি রহিল না;—সভায় আমি কি ভাবে অপমানিত হইয়াছি, সেই কথাই হইতেছে! ঠাকুরমা ও বিশু পরামর্শ করিয়া আমাকে ঐ ভাবে অপদস্ত করিয়াছে, তাহাও আমি স্পষ্ট বুঝিলাম! রাগে আমি ফুলিতে লাগিলাম। যে বিশ্বেশ্বর একদিন মাহিনার অভাবে পড়া ছাড়িতে গিয়াছিল, কেবল আমিই ঠাকুর্দাকে ধরিয়া তাহার পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলাম, সেই বিশ্বেশ্বর কি না আজ আমাকে পাঁচজনকে দিয়া প্রকাশ্য সভায় অপমানিত করাইল! কি নেমকহারাম! তখন আমার মনে হইয়াছিল, আমার এই সৌভাগ্য দেখিয়া সে হিংসার বশে এই কাজ করিয়াছে! স্থির করিলাম, আজ হইতে তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিব না! কিন্তু তখনই মনে হইল, তাহা যে হইবার নহে। কে আমায় প্রবন্ধ লিখিয়া দিবে? এই প্রবন্ধের উপরই যে আমার সমস্ত সৌভাগ্য নির্ভর করিতেছে! তখনই স্থির করিয়া ফেলিলাম—কাজ আদায় করিবার জন্য মৌখিক যতটুকু খাতির দেখান আবশ্যক তাহাই দেখাইব, অন্তরে সে আমার চিরশত্রু হইয়া থাকিবে। এই সৌভাগ্য

লাভের পথে সে-ই ত আমার প্রধান অন্তরায়! নেমক-হারাম, বিশ্বাসঘাতক ঠাকুরমার অবধি মন ভাঙ্গাইবার আয়োজন করিয়াছে।

আমি অন্ধকারের মধ্যে বাহিরের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বিশ্বেশ্বর চলিয়া গেলে সোজা উপরের ঘরে গিয়া উঠিলাম। ঠাকুরমা আমায় দুই-তিন বার ডাকিলেন, আমি সে দিকে কানও দিলাম না।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরমা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কি হ'য়েছে তোর? একেবারে যে মেজাজ গরম, এতবার ডাকলাম সাড়া দেওয়া হল না!"

ঠাকুরমার এই কথাগুলি তীক্ষ্ণধার ছুরির মত আমার অন্তরে গিয়া বিঁধিল। আমি যে অন্তরালে থাকিয়া তাহার ও খিশুর সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়াছি; নহিলে, ঠাকুরমার প্রশ্ন আমি সরলভাবেই গ্রহণ করিতাম!

আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলাম, "সব জেনে শুনে আবার জিজ্ঞেস করা হ'চ্ছে—কি হ'য়েছে তোর! আমি-ত তোমার কেউ নই, বিশুই যে তোমার আপনার! আমার খবরে তোমার দরকার কি!"

ঠাকুরমা বোধ হয় মনে মনে খুব হাসিলেন। তিনি আমার কথায় কিছুমাত্র রাগ না করিয়া হাসিতে হাসিতে

আমার কান দু'টি মলিয়া দিয়া কহিলেন, "পরে বুঝবি—ভূত যখন কাঁধে চাপে, তখন মানুষের এই রকমই অবস্থা হয়। দেখি না তোর দৌড় কদ্দূর!" বলিয়া ঠাকুরমা চলিয়া গেলেন।

আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সময় অনিমা একখানি পাখা হাতে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি একবার চকিতে তাহার দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

অনিমা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "এখনও জামা খোল নি, ঘেমে যে একেবারে নেয়ে গেছ!" বলিয়া সে হাওয়া করিতে লাগিল।

আমি তাহার হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইয়া রুক্ষ স্বরে বলিলাম, "যাও, অত আদিখ্যেতায় কাজ নেই—ঢের ভালবাসা দেখান হ'য়েছে! তোমরা সবাই আমার শত্রু!"

অনিমার দুই চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। সে বাষ্প-রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "কি করেছি আমি?"

যাহার মুখ ভার দেখিলে আমি অস্থির হইয়া পড়িতাম, আজ তাহার চোখের জল দেখিয়াও আমার মন ভিজিল না। আমি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলাম, "যাও এখান থেকে, আমার কাউকে দরকার নেই।"

অনিমার চোখের জল ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে পাখা হাতে করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি জামা খুলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। বালিসে মুখ ঢাকিয়া রহিলাম। আমার কানের মধ্যে চুড়ি বালার মধুর সিঞ্জন প্রবেশ করিতে লাগিল। দেহে শীতল বাতাসের স্পর্শ অনুভব করিলাম। আমি প্রাণপণে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম।

ঠাকুরমা জোর করিয়া ধরিয়া তুলিয়া খাওয়াইয়া দিয়া গেলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অনিমা আমায় বাতাস করিল, আমার পা টিপিয়া দিল। গভীর রাত্রে আমি হঠাৎ তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলাম। তাহার চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। আমি তাহার সহিত কোন কথা বলিতে পারিলাম না।

আরও পনর দিন কাটিয়া গেল। আমি প্রত্যহই নূতন নূতন জামা কাপড় পরিয়া ছড়ি হাতে করিয়া চন্দ্র-বাবুর বাড়ী যাইতাম। কখনও তাঁহার সহিত দেখা হইত, কখনও বা হইত না।

বিশ্বেশ্বর প্রতিদিন যথানিয়মে আমাদের বাড়ী আসিত, ঠাকুরমার সহিত কি পরামর্শ করিত। আমি তাহার

সহিত দুই একটির বেশী কথা বলিতাম না। মাঝে মাঝে এমন ভাব প্রকাশ করিতাম যেন তাহার সহিত কথা বলিতে আমি ঘৃণা বোধ করি। কিন্তু তাহার মুখ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল দেখিতাম, আমার ব্যবহারে সে এতটুকু বিষণ্ণ হইত না।

চন্দ্রবাবুর কথা উল্লেখ করিয়া সে আমায় মুখে কিছু বলিত না। কিন্তু কৃষ্ণ-বলরামের দল পথঘাটে আমায় নানারূপ ঠাট্টাবিদ্রূপ করিত। আমি বেশ বুঝিতাম ইহা বিশুরই কাজ। আমি তাহার উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলাম! এ সংসারে অনেক সময় এমনই ঘটিয়া থাকে, লোকে আসল ফেলিয়া নকলে মজে!

[৮]

এতদিন বেশ চলিতেছিল। অবশ্য তখন মনে করিয়াছিলাম বেশ! এইবার ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাকের দুরবস্থা আরম্ভ হইল। একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলাম! একদিন প্রসিদ্ধ এক জমিদার-ভবনে আমার নিমন্ত্রণ হইল। কোথাকার একজন প্রথিতনাম্নী বাইজী নৃত্যগীত করিবে তাহারই নিমন্ত্রণ! আমার নিমন্ত্রণ হইল, চন্দ্রবাবুর বাড়ী বসিয়া। প্রসিদ্ধ জমিদারবাবু যখন চন্দ্রবাবুকে

নিমন্ত্রণ করিতে আসেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, তাই আমারও নিমন্ত্রণ হইল। আমি যেন স্বর্গ হাতে পাইলাম।

সন্ধ্যার পরে জমিদার-ভবনে উপস্থিত হইলাম। সারা-গৃহখানি ফুলের মালা পরিয়া আলোর কিরণ মাখিয়া হাসিয়া আকুল হইতেছিল। মনে হইল, কোথায় লাগে চন্দ্রালোক। মর্ত্ত্যের এই ধনকুবের সেকালের রাবণের মত চন্দ্রের সমতুল্য পাঁচ সাতটি জ্যোতিষ্মান্ গ্রহকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন! ধন্য তাহারা!

হলঘরে প্রবেশ করিয়া আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই ত স্বর্গ! স্বর্গ আর কাহাকে বলে! ঐ যে সুকোমল গালিচার উপর স্বর্গের অপ্সরী বাইজীর বেশ ধরিয়া বসিয়া আছে! তাহার গলায় ঐ যে পারিজাতের মালা ঝুলিতেছে!

চন্দ্রবাবুর ঠিক পার্শ্বেই আমি উপবেশন করিলাম। মুহূর্ত্ত পরেই দেখিলাম বাইজী চন্দ্রবাবুর দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল, চন্দ্রবাবুও মৃদু হাসিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন।

বাইজী উঠিয়া দাঁড়াইল। মুগ্ধ দর্শকের দল নির্নিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বাইজীর দেহের

অলঙ্কারগুলি যেন হঠাৎ প্রাণ পাইয়া বাজিয়া উঠিল। বাজনদারেরা বাজনা ধরিল। বাইজী হস্তসঞ্চালনের কৌশল প্রদর্শন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিল।

আমি একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—আমি সঙ্গীতবিদ্যা কখনও চর্চ্চা করি নাই সত্য, কিন্তু হাত নাড়িয়া নৃত্যগীতের সঙ্গে তাল দেওয়া আমার একটা অভ্যাস ছিল। অভ্যাস দমন করা ভারি কঠিন ব্যাপার, আমি এ ক্ষেত্রে তবুও প্রাণপণ শক্তিতে অভ্যাসটিকে দমন করিয়া রাখিলাম; কিন্তু চন্দ্রবাবু সব মাটি করিয়া দিলেন। তিনি নানা ভঙ্গী করিয়া হাত নাড়িতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে বাহবা বাহবা বলিতে লাগিলেন। আমার সেই মজ্জাগত অভ্যাস সুযোগ বুঝিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। আমিও চন্দ্রবাবুর অনুকরণ করিয়া হাত নাড়িতে ও পা নাচাইতে লাগিলাম এবং চন্দ্রবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ হইতে বাহবা-বাহবা ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু হায়, আমি যে ময়ূরের দলে দাঁড়কাক। বাইজীকে খুব বাহাদুরী দিই—সে আমাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চিনিয়া ফেলিল। ধন্য তাহাদের লোক চিনিবার শক্তি!

সহসা বাইজী নৃত্য থামাইয়া ভ্রুকুটিকুটিলকটাক্ষে

আমার দিকে চাহিল। বাজনাও সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। সকলে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া বাইজীর দিকে কেবলই চাহিতে লাগিল।

বাইজী গৃহস্বামী জমিদারের দিকে চাহিয়া কহিল, "বাবুসাহেব আমায় ডেকে এনে অপমান করালেন?"

জমিদারবাবু একবারে কিস্তু হইয়া মুখখানি শুষ্ক করিয়া কহিলেন, "সে কি—সে কি! কে, কে আপনাকে অপমান করলে?"

বাইজী আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "এই লোকটা বার বার আমায় হাত নেড়ে ইসারা করছে।"

সকলে বিরক্তভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া গেলাম। আমার মুখ চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ, কখন ইসারা করিলাম!—

এমন সময় বহুলোক সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "অসভ্যতা, নীচতা, বর্ব্বরতা—অমার্জ্জনীয়—অমার্জ্জনীয়! প্রকাশ্য সভাস্থলে একজন নারীর অপমান!"

সেই দলে হাকিম, উকিল, অধ্যাপক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, জমিদার সকলেই ছিলেন।

আমি জ্ঞানতঃ কিছুই করি নাই। অথচ সকলে মিলিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সব চেয়ে বুকে বাজিল, চন্দ্রবাবুর অটল মৌনতা! মনে হইল, চুপ করিয়া থাকিলে অপরাধ স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। তাই হাত জোড় করিয়া বিনয়নম্রবচনে কহিলাম, "আমার একটা নিবেদন—"

কিন্তু কে কাহার কথা কানে তোলে। আমায় কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া উকীল মহাশয় উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এর আবার নিবেদন কি! যাঁকে অপমান করেছেন, তিনি যখন নিজমুখে বলছেন, তখন আইনমতে আপনি দোষী—এতে কোন সন্দেহ নেই।"

আমি তেমনই যুক্তহস্ত হইয়া কহিলাম, "আমার কথাটা—"

এবারেও উকীলমহাশয় আমার কথা শেষ করিতে দিলেন না; আরও চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আপনি বলতে চান, একজন রমণী এত লোকের সাম্‌নে মিথ্যাকথা বলেছেন? জানেন এত বড় একটা দোষ করে ঢাকতে যাওয়া কত বড় অন্যায়?"

আমি মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। পুনর্ব্বার কহিলাম, "আপনারা আমার বক্তব্যটাই একবার শুনন—"

হাকিম বলিয়া উঠিলেন—“এতে শোনা-শুনি কিছুই নেই। এ বয়সে আমি অনেক ব্যাপার দেখেছি—এ দস্তুর মত মানহানি—একজন স্ত্রীলোককে অপমান, আদালতে এ ব্যাপার উঠলে, শাস্তি অনিবার্য্য।”

আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছিলাম না। মনে মনে বলিলাম, “তোমার—মাথা! মামলা করছেন না, পিণ্ডি দিয়েছেন!” তার পর প্রকাশ্যে কহিলাম, “আচ্ছা আর কে কি বলবেন, একেবারে বলে নিন—পরে আমার যা বলবার আছে বল্‌ব।”

ডাক্তারবাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “ডাক্তারী-পরীক্ষায় যে আপনি পাগল সাব্যস্ত হবেন, আপনার চেহারা দেখে ত তা মনে হয় না। তবে যদি বেশী টাকা খরচ করতে পারেন ত আলাদা কথা।”

এত ভারি আপদে পড়িলাম। আমার যাহা বলিবার এবারে তাহা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলাম,— “চন্দ্রবাবু হাত নাড়াইতেছিলেন, তাই তাঁর দেখাদেখি আমিও হাত নেড়েছিলাম, ইসারা করতে যাব কেন?” কি ভাবে হাত নাড়িয়াছি তাহা দেখাইবামাত্র সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অধ্যাপকমহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “লজিকেলী

আপনার আর্গুমেণ্ট ফ্যালেসাস হ'য়ে গেল, অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র অনুসারে আপনার কথা ও কার্য্যে প্রমাণ হয়ে গেল—আপনি ইসারা করেছেন।"

উকীল লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "বস্—নিজমুখে একবার, এবার যাবেন কোথায়!"

দশচক্রে ভগবান ভূত হইয়া যায়; আমি কোন্ ছার! পলায়ন করাই আমি উদ্ধারের একমাত্র পথ স্থির করিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

সেদিন সত্যই আমার নিজের উপর ঘৃণা জন্মিল, সমগ্র মানবজাতির উপর ঘৃণার উদ্রেক হইল! যে চন্দ্রবাবুর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য বিশ্বেশ্বরের ও আমার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, অনিমার সঙ্গ আমার নিকট বিরক্তজনক বোধ হইয়াছে, ঠাকুরমার অপরিসীম স্নেহ আমার নিকট উপেক্ষার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই চন্দ্রবাবুর কিনা এই ব্যবহার! তাঁহার সম্মুখে পাঁচজনে আমায় বিনা কারণে অপমান করিল, আর তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন, আমার হইয়া একটা কথাও বলিলেন না! এই কি আমাদের দেশের মানুষ! উকীল, হাকিম, ডাক্তার, অধ্যাপক—ইহারা সকলেই ত

জমিদারবাবুর মনস্তুষ্টির জন্য আমায় নির্ব্বিচারে অপমানিত করিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। ধিক্ ধিক্ তাহাদের শিক্ষায়! আমি স্থির করিলাম, না, আর কাহারও সহিত মিশিব না। মনুষ্য-সমাজ হইতে দূরে, বহু দূরে থাকিব। যেখানে দু'চোখ যায় চলিয়া যাইব!

এই ভাবিতে ভাবিতে দুই তিনটী গলি পার হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছি, এমন সময় কে একজন আমার কাঁধে হাত দিতেই ফিরিয়া দেখি, বিশু! এমন সময় এ রাস্তায় বিশুকে দেখিয়া আমার সত্যই ভারি আশ্চর্য্য বোধ হইল। পরক্ষণেই মনে হইল, বিশু হয় ত সেখানে উপস্থিত ছিল। আমার অপমানে উৎফুল্ল হইয়া বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিবার জন্য আমার অনুসরণ করিয়াছে। আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, আমি বাধা দিয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "ভাল হবে না বলছি—"

বিশু অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে এক হাতে আমার গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "তুই কেন ভাই শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছিস্?"

তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমনই একটা করুণ সুর

বাজিয়া উঠিল যে, আমি আর তাহার উপর রাগ করিতে পারিলাম না। তাহা হইলে বিশু কি সেখানে যায় নি? নিঃসংশয় হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুই এদিকে কোথায় যাচ্ছিলি?"

বিশু কহিল, "একটি ছেলে পড়াতে গেছলাম, আজ পনের দিন হ'ল ছেলে পড়াবার কাজ নিয়েছি যে।"

তাহার উপর মিথ্যা রাগ করিয়াছিলাম বলিয়া সত্যই অনুতপ্ত হইলাম, কুণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, "কিছু মনে করিস্‌নে বিশু, মনটা আমার ভারি খারাপ।"

বিশু সরলভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "জমিদার-বাড়ীতে কি তোর সঙ্গেই গোলমাল হ'য়েছিল না কি?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। কি সর্ব্বনাশ! যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাই ঠিক। বিশু মিথ্যাবাদী, প্রতারক! আমার মনের মধ্যে দ্বিগুণ মাত্রায় আবার ক্রোধের সঞ্চার হইল! তখনও তাহার হাতখানি আমার কাঁধের উপর ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার হাতখানি দূরে সরাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলাম, "জোচ্চর মিথ্যাবাদী, সব জেনেশুনে আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিস্‌!"

বিশু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আমি সত্যি কিছু জানি নি। জমিদারবাবুর ছেলে পড়িয়ে সবে ঘর থেকে

বেরিয়েছি, এমন সময় বাবুর লোকজনের মুখে শুন্‌লাম বাইরে বাইজীকে নিয়ে খুব গোলমাল হ'য়েছে; ব্যাপার যে কি তা কারুর কথায় বুঝতে পারলাম না। আমি অতি সন্তর্পণে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারলাম, শুনেছিলাম তোরও—"

আমি তাহাকে কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া রূঢ়কণ্ঠে কহিলাম, "ঢের হ'য়েছে—আর শুনতে চাই না। আমি তোকে বারণ করে দিচ্ছি বিশু, আজ থেকে আমার কোন সম্পর্কে থাকতে পারবি নি।" বলিয়া তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলাম।

বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া দেখি, বিশু আমার পিছনে পিছনে আসিতেছে! কি আপদেই পড়া গেল! যেখানেই যাইতেছি, এ যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি গুপ্তচরের মত আমার অনুসরণ করিতেছে! নিশ্চয়ই এ ঠাকুরমাকে আমার অপমানের সংবাদ দিতে যাইতেছে। না, ইহাকে কিছুতেই গৃহে প্রবেশ করিতে দিব না। এই স্থির করিয়া আমি প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম।

খানিকক্ষণ পরে দরজায় ধাক্কা পড়িতে লাগিল। "অ-সুরো, সুরো দরজা খোল না?"

আমি তাহার কথায় কান দিলাম না। দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু ডাকের বিরাম হইল না।

এমন সময় ঠাকুরমা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আমি বলিয়া উঠিলাম, "দেখ, বিশুকে যদি আজ বাড়ী ঢুকতে দাও, তা হ'লে কিন্তু ভাল হবে না।"

ঠাকুরমা আমার রকম-সকম দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন; কহিলেন, "একেবারে আস্ত পাগল, কি করব, অনুটা এখনও তেমনই খুকী হ'য়ে রইল—একটু চালাক হ'ল না। থাকৃত যদি আমার অনুর মত বয়েস, দেখতাম তোর এ পাগলামি সারাতে ক'দিন লাগে। আজ বুঝি কোথায় আবার অপমান হ'য়ে এসেছিস, তাই যত রাগ দেখাচ্ছিস বিশুর ওপর! যা কাপড় জামা ছেড়ে ঠাণ্ডা হগে যা।"

ঠাকুরমার উপর মনে মনে বিরক্ত হইলেও. মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার সাহস আমার ছিল না। আমি নীরবে তাঁহার আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইলাম। অন্তরে ফুলিতে ফুলিতে উপরে চলিয়া গেলাম। অনিমা কোথা হইতে আমার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। আমি মড়ার মত বিছানার উপর পড়িয়া

রহিলাম। সে দিন কি জানি কেন তাহার হাত হইতে পাখাখানি কাড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম না।

আমার পার্শ্বের ঘরে ঠাকুরমা থাকিতেন। দুই একটা কথা যা আমার কানে গেল, তাহা হইতেই বুঝিলাম, বিশু ও ঠাকুরমার মধ্যে আমার সম্বন্ধে কি কথাবার্ত্তা চলিতেছে; আমি তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলাম। অনিমা মৃদুকণ্ঠে কহিল, "এর মধ্যে উঠ্‌লে কেন, আরও খানিক শুয়ে থাক আমি হাওয়া করি।"

আমি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া চাপা গলায় কহিলাম, "আর অত আদিখ্যেতায় কাজ নেই! ঢের হ'য়েছে—রেখে দাও পাখা।"

অনিমা ভয়ে ভয়ে পাখাখানি বিছানার উপর রাখিয়া দিয়া মলিনমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিশু বলিল, "কি যে ব্যাপার হ'য়েছে তার আমি কিছুই জানি নি—যখন গোলমাল হয় আমি তখন ভেতরের ঘরে পড়াচ্ছিলাম, তার পর বড় রাস্তার কাছে সুরোর সঙ্গে দেখা।"

ঠাকুরমা কহিলেন, "তোকে দেখেই বুঝি খুব রেগে গেছে?"

বিশু কহিল, "ওর রাগের কথা তুমি রেখে দাও ঠাকুরমা, কে গ্রাহ্য করে।"

আমি মনে মনে বলিলাম, "বটে এত বাড় হ'য়েছে। দুধকলা দিয়ে পুষলাম কি না, তাই দংশন করবে বৈ কি! আমায় এখন আর গ্রাহ্য করবে কেন!"

ঠাকুরমা গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "দেখিস্ লক্ষ্মী ভাই আমার, শেষ অবধি এই মনের জোরটা যেন তোর থাকে।"

বিশু ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "তুমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না ঠাকুরমা?"

ঠাকুরমা কহিলেন, "ওরে তোকে খুব বিশ্বাস করি—তবে এক এক সময় ভয় করে, তুই কত সহ্য করবি!"

বিশুর হাস্যধ্বনি আমার কর্ণে আসিয়া বাজিল! সে কহিল, "গালাগালি মার-ধোর এই ত, তা আমি খুব সহ্য করতে পারব।"

ঠাকুরমা কহিলেন, "তা, আমি খুব জানি—ও সব তুই খুব সহ্য করতে পারবি। দেখ, আমি একটা কথা বলি, তুই আর ওকে লিখে দিস্‌নি। তা হ'লে হয় ত ও জব্দ হতে পারে। তোরই লেখা নিয়ে ত ওর সব জারিজুরি।"

আমি আড়ষ্ট হইয়া গেলাম! ঠাকুরমা তাহা হইলে আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী নহেন!

বিশুর কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে যাইতেই চিন্তাস্রোত আবার রুদ্ধ হইয়া গেল!

সে কহিল, "না ঠাকুরমা, ওতে কাজ নেই। যা হ'ক বড়লোকের কিছু টাকা ঘরে আস্‌ছে মন্দ কি! পাঁচ ভূতে খায়, না হয় ভাল কাজে কিছু তাদের হাত গলে বেরুল।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "ওর সব ভার তোর ওপর।"

[৯]

সে দিন আহারের সময় কাহারও সহিত কথা বলিলাম না। নিঃশব্দে আহার শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। পড়িয়া পড়িয়া কত কথা ভাবিতে লাগিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম—আর লেখার জন্য বিশুর কাছে যাইব না; নিজেই লিখিব। লেখা ত এমন কোন দুরূহ ব্যাপার নহে? বিশু না হয় বি-এ পড়িতেছে, —তাই বলিয়া যাহারা বি-এ পড়ে না, তাহারা বুঝি অপদার্থ—তাহারা বুঝি কিছুই জানে না, এমন কি দুই ছত্র লিখিতেও পারিবে না! বি-এ পাশ করার সহিত লেখার কি সম্বন্ধ। যাহারা বি, এ পাশ করে, তাহাদের ত পুঁথিগত বিদ্যা—তাহারা জানে কি? দু'খানা বই মুখস্থ

করিয়া পরীক্ষার গণ্ডী উত্তীর্ণ হয় এই পর্য্যন্ত! তাহারা লেখাপড়ার কি ধারধারে!

এইটি যে ঠিক আমার নিজের ধারণা, এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না। চন্দ্রবাবুর দরবারে নানা রকমের লোক আসিতে দেখিতাম। তাহাদের অধিকাংশই বিদ্যাবুদ্ধিতে আমারই সমকক্ষ, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ! আমিও যেমন বিশুকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া, তাহার প্রাপ্ত যশ অপহরণ করিতাম, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সেই-পথাবলম্বী। এই কৃত্রিমতার যুগে যে বাহিরে চটক দেখাইতে পারে—কথায় বল, আর পোষাক-পরিচ্ছদই বল, সেই বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ধনবান্ বলিয়া অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও ধূমকেতু হইয়া থাকিতে পারে। যাক্ আমারই মত এই না-পাশ করিতে-পারার দলের সকলের এক বিষয়ে ভারি মিল দেখিতে পাইতাম। সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এম, এ, উপাধিধারী হইতে আরম্ভ করিয়া "রাইচাঁদ প্রেমচাঁদ" পর্য্যন্ত সকলকে মূর্খ প্রতিপন্ন করিবার জন্য তারস্বরে চীৎকার করিত। তাহাদের মুখে ঐ এক কথা,—'কি করে যে পাশ করলে আশ্চর্য্য; একেবারে গোমূর্খ,—কিছুই জানে না!' এমন দুই তিন জনকে জানি যাহারা

সেই বি, এ, এম, এ উপাধিকারীর পিঠ চাপড়াইয়া নানা কৌশল করিয়া কোন একটি বিষয় ইংরাজীতে তর্জ্জমা করাইয়া লইয়া বাহিরে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছে, 'এরা বোধ হয় ধান চাল দিয়ে লেখাপড়া শিখেছিল, না হ'লে এক লাইন ইংরেজী লিখতে জানে না। একজন এম,একে একটা ইংরেজী বিষয় লিখতে দিয়েছিলাম —কি যে মাথামুণ্ড লিখেছে তার ঠিক নেই—সমস্ত বাদ দিয়া ফের আমায় নূতন করে লিখতে হ'ল!' এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে এমনই বিকটরবে সে হাসিয়া উঠিয়াছে যে কাহাকে কিছু বলিবারও অবকাশ দেয় নাই। বুঝিতে পারি না, কেন এই ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। ইহা কি তাহাদের সেই দ্রাক্ষা-রসাস্বাদে বঞ্চিত শৃগালের চরিত্রানুকরণ? কাহার কাছে যেন একটা গল্প শুনিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে যে, এমন দু চারিটি সারমেয় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা চাঁদের আলো সহ্য করিতে না পারিয়া ঘেউ-ঘেউ করিয়া বেড়ায়—সেই গল্পের সহিত কি এ ব্যাপারের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে? অন্তর্যামীই জানেন। আমি নিজে কিছু বলিব না, কেন না আমিও যে সেই দলের!

প্রাতঃকালে ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া প্রতিজ্ঞা

পালনে কৃতসংকল্প হইলাম। আনমাকে আদেশ করিলাম, "যাও এখনই আমার সব বই নিয়ে বাইরের ঘরে গুছিয়ে রাখ। রোজ এককথা বলতে হবে না কি? একদিন বলে দিয়েছি, তাতে হুঁস থাকে না!"

অনিমা ছলছল চোখে কহিল, "কৈ তুমি ত আগে কিছুই বল নি?"

আমি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলাম, "বলি নি! নিশ্চয়ই বলিছি—এমন ভুল আমার কখনও হ'তে পারে না। যা বলছি মুখ বুজে ক'রবে, কোন কথা শুনতে চাই না।"

অনিমা অঞ্চলপ্রান্তে চোখ মুছিল। পাষাণ আমি, অন্ধ আমি! তাহার চোখের জল দেখিয়াও দেখিলাম না, অন্তরের মধ্যে এতটুকু বেদনা অনুভব করিলাম না।

আমি যে কি লিখিতাম, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। তবে যাহাই আমি লিখি না কেন, অনিমার কাজ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল।, তাহার উপর আমার দাঁতখিঁচুনি খাইতে খাইতে বেচারী জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। আমরা ত অনেক সময় এই রকমই বীরত্ব দেখাইয়া থাকি! এটা আমাদের বাঙ্গলা দেশের মাটির গুণ! আমরা বাইরে অপমানিত হইয়া ঘরে ফিরিয়া নিরীহ পত্নীর উপর তাহার শোধ তুলি!

[১০]

চন্দ্রবাবুর সাহিত মিশিয়া একটা বিষয়ে আমি খুব পাকা হইয়া উঠিয়াছিলাম। কতকগুলি বড় বড় বইয়ের নাম ; ইউরোপাঞ্চলের ও আমাদের দেশের জনকতক নামজাদা লেখকের নাম ও তাঁহাদের লেখার অংশবিশেষ তোতা পাখীর মত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম ! হাজার হ'ক আমরা মানুষ ত ! তাই পাখীর সঙ্গে আমাদের কিছু পার্থক্য ছিল। তবে সব সময় নয় ! পাখীকে যেমন শালা বলিতে শিখাইলে সে যাহাকে দেখে তাহাকেই শালা বলিয়াই ডাকে—আমরা ঠিক ততটা পাখী হই নাই। আমরা অনেক সময় তাক্ বুঝিয়া দু' চারিজন লেখকের নাম ও তাঁহাদের উক্তি আওড়াইতে পারিতাম। তবে মাঝে মাঝে যে বেতালা হইয়া না পড়িতাম, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। আমি হয় ত ফার্সীর 'ফ' জানি না, তবুও বড় বড় ফার্সী গ্রন্থকারের লেখা লইয়া একজন ফার্সী-জানা পণ্ডিতের সহিত অনায়াসেই তর্ক করিতাম,—আমার লেখার মধ্যে ফার্সী পুস্তক হইতে বা উদ্ধৃত করিয়া দিতাম, আর ভাবিতাম, লোকে মা করিতেছে, আমি না জানি একজন কত বড় দিগ্‌গজ

পণ্ডিত! এখানে 'আমি' বলিতে আমাকেই ধরিয়া লইবেন না। উকিল ব্যারিষ্টারগণ যেমন মক্কেলের হইয়া,—সে মক্কেল চোরই হউক, জালিয়াতই হউক, আর স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার হানি করিবার অপরাধে অভিযুক্তই হউক—যেমন 'আমি' বলিয়া আদালতে বক্তৃতা করেন—এক্ষেত্রে আমিও ঠিক সেই রকম আর পাঁচজনের হইয়া 'আমি' বলিয়াছি।

যাহা হউক আমি চারিদিকে বই সাজাইয়া মধ্যস্থলে বসিয়া কখনও এ বই কখনও সে বই খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম। সম্মুখেই খাতা পেন্সিল ও তিনচারিটি ষ্টাইলো পেন সাজান রহিয়াছে। কখনও এ বই হইতে দুই লাইন, কখনও ও বই হইতে দুই লাইন খাতায় তুলিতে লাগিলাম। সে সব লাইনের অর্থ যে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম এ কথা বলিতে পারি না।

আমি যখন মহাগম্ভীর হইয়া বিদ্যা আয়ত্ত করিবার নানা পন্থা অবলম্বনে সচেষ্ট ছিলাম, এমন সময় অনিমা আমার অদূরে দাঁড়াইয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি, একবার মুখ তুলে চাইতেও নেই।"

আমার যদি তখন একটুও কাণ্ডজ্ঞান থাকিত তাহা হইলে অনায়াসে বুঝিতে পারিতাম, অনিমা কতটা বেদনা

বক্ষে চাপিয়া ঠাকুরমার একান্ত পীড়াপীড়িতে এই কথা কয়টি বলিয়াছে !

আমি মুখ না তুলিয়াই বলিলাম, "যাও, যাও বিরক্ত কর না। দেখ্‌তে পাচ্ছ না কাজ করছি।"

অনিমা উত্তর করিল, "হ্যাঁ গা এমন কি কাজ করছ যে আমার দিকে একবার মুখ তুলে চাইতে পারলে না !"

আমি রুক্ষস্বরে কহিলাম, "কেন মিছিমিছি কাজের সময় জ্বালাতন করতে এসেছ।"

অনিমার দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার কানের মধ্যে আসিয়া বাজিল, কিন্তু অন্তর ভেদ করিতে পারিল না। অনিমা গাঢ়স্বরে কহিল, "আচ্ছা আর জ্বালাতন করতে আসব না ! আমি কাছে এলেই যদি তুমি বিরক্ত হও, না হয় আর নাই আসব !"

আমি বিরক্তভরে কহিলাম, "তা এস না, কাজের সময় কেউ এসে শুধু শুধু আমায় বিরক্ত করবে এটা আমি পছন্দ করি না। কাজের কোন সাহায্য করতে পারতে ত বুঝতাম ;—সে ত আর তোমার দ্বারা কিছু হবে না ; শুধু পার জ্বালাতে !"

এমন সময় কি একখানা বইয়ের দরকার হওয়ায় আশে

পাশে খুঁজিতে লাগিলাম, কিন্তু বইখানি দেখিতে পাইলাম না। অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া কহিলাম, "খুব ত আদিখ্যেতা দেখাতে এসেছ! সকালে তোমায় বললাম না ওপরের ঘর থেকে সব বইগুলো এনে এ ঘরে গুছিয়ে রাখবে, তা কথা বুঝি গ্রাহ্যই হ'ল না?"

অনিমা কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, "আমি ত তখনই সব বই এনে রেখেছি।"

আমি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলাম, "এনেছ ত একখানা বই পাচ্ছি না কেন? নিশ্চয়ই সব বই আন নি; দু-একখানা ওপরে ফেলে রেখে এসেছ। একটা কাজে লাগবে না—ভাল আপদে পড়া গেছে!"

অনিমা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে কহিল, "তুমি যখন যা বলছ প্রাণপণে তা করছি, পাছে ভুল্ হয় এই ভয়ে একবারের জায়গায় পাঁচবার করে ওপরের ঘর দেখে আসছি—তবু যদি তোমার আপদ হ'য়ে থাকি সে আমার অদৃষ্ট! যদি আপদই হয়ে থাকি আমায় না হয় তাড়িয়ে দিয়ে তোমার মনের মত আর একটি বিয়ে কর!"

আমি চারিপাশে ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, কিন্তু সেই বইখানি খুঁজিয়া পাইলাম না। বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলাম, "ও সব নাকেকান্না রেখে দাও। সে বইখানা কি

এখান থেকে উড়ে গেল! আমি কোন কথা শুনতে চাই না, যেখান থেকে হ'ক আমার বইখানা এনে দাও?"

অনিমা নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিতে লাগিল। এমন সময় ঠাকুরমা আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন,"বড়লোকের সঙ্গে নতুন মিশে বুঝি বাবুর আমার মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেছে। তুই ত আগে এমন ছিলি নি! এখন বাইরের অপমানের যত ঝাঁঝ আমার এই ভালমানুষ নাতিনীটির ওপর ওগরান হ'চ্ছে। পড়তিস আমাদের মত পরিবারের হাতে দেখিয়ে দিতাম মজাটা!"

আমি জানিতাম ঠাকুরমার সহিত কিছুতেই পারিব না। যাহাই বলি না কেন তিনি কিছুতেই রাগিবেন না, এতটুকু বিরক্তও হইবেন না। এমন লোকের সঙ্গে কি সহজে পারা যায়! কাজেই মাথা ঠাণ্ডা করিতে বাধ্য হইলাম; হাসিয়া কহিলাম, "ও কথা আমি একশ বার মেনে নিতে বাধ্য। ঠাকুর্দ্দাকে দেখলেই তার খুব প্রমাণ পাওয়া যায়।"

ঠাকুরমা কহিলেন,"তবে চুপ করে থাক,আমার নাতবউটি কি তোর কেনা-দাসী যে যখন-তখন এমনই তম্বি করবি!"

আমি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলাম, "তম্বিটা কি করলাম ঠাকুরমা?"

ঠাকুরমা হাসিয়া কহিলেন, "দেখ, আমি গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত তোর সব কথা শুনেছি। আমার কাছে আবার লুকোচুরি কেন।"

আমিও হাসিয়া উত্তর করলাম, "তুমি ত ভারি দুষ্টু, ঠাকুরমা, আড়ি পেতে আমাদের কথা শোন? কিন্তু যাই বল ঠাকুরমা, তুমি সত্যিই একচোখো, তুমি কেবল ওর দিকে টেনেই কথা বল। এই যে কাজের সময় বইখানা পাচ্ছি না, তার বেলা ত ওকে কিছু বলছ না?"

ঠাকুরমা বলিলেন "বই পাচ্ছিস না তা অনু কি করবে! বিনি পয়সার দাসী পেয়েছিস খুব ত খাটিয়ে নিচ্ছিস;—তার ওপর ক'দিন ধরে দেখছি সব সময় কেবল বক্‌ছিস্, মুখে দুটো মিষ্টি কথা নেই! ভারি বড়লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা হ'চ্ছে। মাইনে-করা ঝির ওপর যদি এর সিকি তম্বিটা করতিস্ দেখতিস্ পাঁচটা মুখ-ঝাম্‌টা দিয়ে সে চলে যেত।"

এমন সময় হেঁট হইয়া তিনি মেঝের উপর হইতে কি একখানা বই তুলিলেন। আমি দেখিলাম যে বইখানার খোঁজ করিতেছিলাম এ যে সেই বইখানা! আমি ভারি বিব্রত হইয়া পড়িলাম। ঠাকুরমার কাছে এখনই কড়া-কড়া কথা শুনিতে হইবে!

ঠাকুরমা বইখানা আমার চোখের সামনে ধরিয়া কহিলেন, "এই বইখানা খুঁজছিলি কি?"

আমি অনায়াসেই 'না' বলিতে পারিতাম। কিন্তু মিথ্যা কথা বলিতে পারিলাম না। মিথ্যা বলিলেও ঠাকুরমার কাছে ধরা পড়িয়া যাইতাম, কেন না তিনি জোর করিয়াও আমার নিকট হইতে সত্য কথা বাহির করিয়া লইতেন। তাই অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কহিলাম, "হ্যাঁ এই বইখানা।"

ঠাকুরমা বলিয়া উঠিলেন"দে ত অনু ওর কানটা মলে।" অনিমাকে নড়িতে না দেখিয়া ঠাকুরমা আবার কহিলেন, "এগিয়ে আয় না; বেশ করে কানমলা না খেলে ও সায়েস্তা হবে না। মুখটি নীচু করে রইলি কেন? এগিয়ে আয় না। না তোকে দিয়ে দেখ্‌ছি কোন কাজ হবে না! আচ্ছা তোর হ'য়ে আমিই ওর কান মলে দিচ্ছি।

এই বলিয়া ঠাকুরমা সত্যসত্যই আমার কান দুইটা ধরিলেন।

আমি দুই হাত জোড় করিয়া কহিলাম, "ঘাট হ'য়েছে ঠাকুরমা, আর করব না।"

ঠাকুরমা তবুও কান ছাড়িলেন না, কহিলেন, "আমার কাছে ঘাট মানলে কি হবে, অনুর কাছে ঘাট মান।"

আমি অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলাম, "এই মানছি ঠাকুরমা।"

এই ভাবে সে দিন ঠাকুরমার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম।

[১১]

দুই তিন দিন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া একছত্রও লিখিতে পারিলাম না। কি যে লিখিব কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। বুঝিলাম যতটা সোজা মনে করিতাম, লেখা ততটা সহজ নহে। এও একটা বড় বিদ্যা; আয়ত্ব করা বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন সাপেক্ষ!

এ কয়দিন চন্দ্রবাবুর ওখানেও যাই নাই। তিনি তাগিদের উপর তাগিদ করিয়া লোক পাঠাইতে লাগিলেন। একখানি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় তাঁহার নাম দিয়া বিশুর লেখা প্রবন্ধটি ধারাবাহিক বাহির হইতেছিল, বাজারে তাঁহার খুব নাম পড়িয়া গিয়াছিল, সকলেই খুব বাহবা দিতেছিল! কাজেই চন্দ্রবাবু স্বয়ং আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি যে তাঁহাকে লইয়া কি করিব তাহা বুঝিতে পারিলাম না! আমার বাড়ীতে তাঁহার মত অত বড় লোকের পদধূলি পড়া ভ

কম ভাগ্যের কথা নহে! মনে হইল আমার গৃহ যেন পবিত্র হইয়া গেল।

তিনি আসিয়াই লেখা চাহিলেন, আমি বিব্রত হইয়া পড়িলাম!—লেখা যে কাহার তাহা ত চন্দ্রবাবু জানেন না!

আমি ইতস্ততঃ করিয়া কহিলাম, "এর জন্যে আপনি কষ্ট করে এতদূর এলেন কেন? আমি আজই সন্ধ্যের সময় নিয়ে গিয়ে হাজির হ'তাম।" মিথ্যা কথা বলা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু একটা মিথ্যাকে সমভাবে বজায় রাখিবার জন্য যে অসংখ্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়! আমারও তাহাই হইল।

চন্দ্রবাবু কহিলেন "আজ দশটার মধ্যে যে কিছু কপি দিতেই হবে, যতটা হ'য়েছে তাই পাঠিয়ে দেওয়া যাক, বাকিটা কাল সকালে পাঠালেই চল্‌বে। দেখি কতটা লিখেছেন?"

আমার অবস্থা যে তখন কিরূপ হইল, তাহা বোধ করি কাহাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না! হা ভগবান, এ কি বিপদে ফেলিলে! কি উত্তর দিব! এইবার বুঝি ধরা পড়িয়া গেলাম! উপায়!

আমার অন্য কোন গুণ থাকুক আর না থাকুক

আমার একটা বিশেষ গুণ ছিল, তাহা আমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ;—অতি সত্বর একটা মিথ্যা কথা রচনা করিতে পারিতাম। তবে এ গুণটা আমার পূর্ব্বে ছিল না ; লেখক নামে পরিচিত হইবার পর হইতে এই গুণটি আমার মধ্য হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ফস্ করিয়া আমি বলিয়া ফেলিলাম, "প্রবন্ধ ত আমার কাছে নেই, একজনকে নকল করতে দিয়েছি।"

চন্দ্রবাবু কহিলেন,"চলুন তার বাড়ী গিয়ে প্রবন্ধটা নিয়ে আসি।"

কি মুস্কিল! মিথ্যা কথার ফোয়ারা ছুটাইয়া দিলাম! কহিলাম, "আপনি আসবার একটু আগেই সে নিয়ে গেছে, এখন কি আর কিছু করতে পেরেছে!" তবুও নিস্তার পাইলাম না। গরজ বড় বালাই!

চন্দ্রবাবু কহিলেন, "চলুন বসে থেকে অন্ততঃ খানিকটা নকল করিয়ে নিয়ে যাই।"

এমন আপদেও মানুষে পড়ে! হায়, বিশুর উপর রাগ কারবার এই শাস্তি! কিন্তু একটা উত্তর ত দিতে হইবে! কহিলাম, "সে এক জায়গায় ছেলে পড়াতে গেছে, ফিরতে দুঘণ্টার ওপর দেরী হবে, আমি সন্ধ্যার আগেই প্রবন্ধ নিয়ে আপনার ওখানে হাজির হব।"

চন্দ্রবাবু ঈষৎ বিরক্তভরে কহিলেন, "তাই হবে। আজ সন্ধ্যার আগে কিন্তু পাওয়াই চাই।" বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

বাপরে রক্ষা পাইলাম! আমার ঘাম দিয়া যেন জ্বর ছাড়িয়া গেল! এ বিপদ ত এক রকম কাটিল, কিন্তু সম্মুখে যে আর একটি প্রকাণ্ড বিপদ! বিশু কি প্রবন্ধ লিখিয়া রাখিয়াছে? কেনই বা রাখিবে! প্রবন্ধে আমারই ষোল আনা দরকার, তাহার ত কিছুই নাই। সে কেন শুধু শুধু আমার জন্য মিথ্যা পরিশ্রম করিতে যাইবে। এ কয়দিন তাহার সহিত কথা অবধি বলি নাই, সে কথা বলিতে আসিলে রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছি! তাহারও ত রক্তমাংসের শরীর, সে-ই বা কেন আমার রাগ সহ্য করিবে। সে ত এখন অনায়াসেই বলিতে পারে—আর লিখিতে পারিব না! তাহা হইলে? দুই তিন মাসের পারিশ্রমিক ত মারা যাইবেই, তাহার উপর আমার এই গোঁফদাড়ি কামানও একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে! আমার বুক কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু ভাবিয়া ফল কি! আমি স্থির করিলাম, বিশুর হাত ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রবন্ধ চাহিব—সে আমায় ভালবাসে—আমায় নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবে। আমার কথায় যদি না

শোনে, ঠাকুরমার কথা সে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

তৎক্ষণাৎ বিশুর সহিত দেখা করিবার জন্য বাহির হইলাম। দূর হইতে দেখিলাম, বিশু তাহার কক্ষে বসিয়া এক মনে পড়িতেছে। হঠাৎ বই হইতে মুখ তুলিতেই সে আমায় দেখিতে পাইল। কই সে ত অভিমান করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল না! তখনই বইয়ের পাতা মুড়িয়া কক্ষের বাহির হইয়া সে আমার মনের সমস্ত আশঙ্কা দূর করিয়া হাসিতে হাসিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তোর প্রবন্ধ শেষ করে রেখে দিয়েছি, আজ নিয়ে যাবি?"

আমি স্তব্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বিশু মানুষ না দেবতা?

বিশু কহিল, "আমার মুখের দিকে অমন হাঁ করে চেয়ে কি দেখছিস রে?"

আমি কহিলাম, "প্রবন্ধটা দে, আমি এখনই চন্দ্রবাবুকে দিয়ে আসি।"

প্রবন্ধ লইয়া বাহির হইলাম। কিন্তু চন্দ্রবাবুর বাড়ী গেলাম না। মিথ্যা কথা যে ধরা পড়িয়া যাইবে! পথে যাইতে যাইতে ভাবিলাম, বিশুই প্রকৃত বন্ধু। না, আর তাহার উপর রাগ করিব না। এখন আমরা যাহাদের বন্ধু

বলি, বিশু যে সে শ্রেণীর বন্ধু নহে! বিপদে আপদে যে বুক পাতিয়া দেয়, সময়ে অসময়ে, সুবিধা অসুবিধায় যে সমভাবে ব্যবহার করে সে-ই ত প্রকৃত বন্ধু! "রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি সঃ বান্ধবঃ"; এই রকমের কি একটা সংস্কৃত শ্লোক যেন কোথায় পড়িয়াছিলাম, কিম্বা শুনিয়াছিলাম,—বার বার তাহাই মনে করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই মনে আসিল না! দূর হ'ক গে ছাই, সে আর ভাবিয়া কি করিব!

হায়, 'বন্ধু' শব্দের অর্থ এখন কিরূপ বিকৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাত ছড়াইলে যেমন কাকের অভাব হয় না, এখন পয়সা ছড়াইতে পারিলেই তেমনই বন্ধুর অভাব অনুভব করিতে হয় না; বরং বন্ধুর সংখ্যাধিক্যে আমাদের সময় সময় অস্থির হইয়া উঠিতে হয়! ঠাকুরমার কাছে নানারকম বন্ধুর গল্প শুনিয়াছিলাম, সেই সব কথা মনে উঠিতে লাগিল। একটা গল্পের কথা বলি,—"ঠাকুর্দ্দার না কি এক শৈশব-বন্ধু ছিল। সে এক বড় জমিদারের ছেলে। ঠাকুর্দ্দার পিতা অর্থাৎ আমার প্রপিতামহ—নিজের ক্ষতি করিয়াও সেই জমিদারের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। যদি তিনি সে সময় জমিদারের সহায় না হইতেন, তাহা হইলে হয় ত তাহার জমি-

দারিই বেহাৎ হইয়া যাইত—একেবারে বেহাত না হইলেও অন্ততঃ লক্ষ টাকা ত বাহির হইয়া যাইতই! সেই অবধি আমাদের দুই পরিবারে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। জমিদার-তনয় আমার ঠাকুর্দ্দার প্রাণের বন্ধু হইয়া দাঁড়ান।

"তারপর এক দুর্দ্দিনে আমার প্রপিতামহ স্বর্গলাভ করিলেন—ঠাকুর্দ্দা অকূল পাথারে পড়িলেন, কেন না তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যান নাই। সংসারে বৃদ্ধ মাতা, সদ্য-বিবাহিতা পত্নী ও এক অবিবাহিতা ভগিনী লইয়া ঠাকুর্দ্দা চোখে অন্ধকার দেখিলেন! তখন এক মাত্র ভরসা সেই জমিদার-নন্দন! ঠাকুর্দ্দা বড় আশা করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন! হায়রে বন্ধু! জমিদার-তনয় মুখে বিশেষ সমবেদনা দেখাইয়া কহিলেন, "এখন ত ভাই হাতে কিছু নেই, জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাদের কিস্তির সময়, সেই সময় তোমায় দেব।" তখন সবে কার্ত্তিক মাস! ঠাকুর্দ্দা ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু বন্ধুর কথা সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়া এই কয়মাস এক বেলা খাইয়া অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ইতিমধ্যে শূন্য-হস্ত জমিদারনন্দন দশ হাজার টাকায় এক প্রকাণ্ড জুড়ি কিনিয়া ফেলিলেন; কিন্তু আমার ঠাকুর্দ্দাকে সামান্য দু পাঁচশ টাকা দিয়া সাহায্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার অর্থাভাব!

"দুর্দ্দিনের পূর্ব্বে সেই জমিদার-গৃহে ঠাকুর্দ্দার প্রায় প্রতিদিনই নিমন্ত্রণ হইত, ঠাকুর্দ্দা কোন দিন তাঁহার বাড়ী না যাইতে পারিলে, তিনি ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিতেন! কিন্তু ঋণস্বরূপ কিছু টাকা চাহিবা- পর হইতেই বন্ধুবর ঠাকুর্দ্দার খোঁজ লওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন! ঠাকুর্দ্দা মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন,—অবশ্য তিনি অন্তরের টানেই যাই- তেন টাকার লোভে নহে। কেহ কেহ ঠাকুর্দ্দাকে বলি- তেন, 'ওহে বন্ধুর কাছে কখনও টাকা চাইতে নেই; তা হ'লেই বন্ধু বিগড়ে যাবে।' ঠাকুর্দ্দা বলিতেন, 'অসময়ে বন্ধুর কাছে চাইব না ত কি পরের কাছে হাত পাততে যাব!'

কিন্তু ঠাকুর্দ্দা তখন জানিতেন না, "অসময়ে হায় হায় বন্ধু কেহ নয়।" বন্ধুর সম্বন্ধে তখনও তাঁহার প্রকৃষ্ট জ্ঞান জন্মায় নাই!

ঠাকুর্দ্দা যদি তখন 'বন্ধু'র প্রকৃত অর্থ বুঝিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অত মনঃকষ্ট পাইতে হইত না। বন্ধু বন্ধুর সহিত কি রূপ ব্যবহার করিবে? 'বন্ধু বন্ধুর বাড়ী যাইবে, হাসিবে, গল্প করিবে ফিরিয়া আসিবে, জে না হয় এক পেট খাইবে; পথে যদি কাহারও

সহিত দেখা হয় তাহা হইলে বন্ধুটির বিরুদ্ধে ফস করিয়া দুই এক কথা বলিয়া লইবে—এমনভাবে বলিবে যেন সত্যই বন্ধুর প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য কথাগুলি বলিতেছে! বাস্ এই পর্য্যন্ত! বন্ধু-বন্ধুর নিকট কখনও দুঃখ অভাবের কথা জানাইবে না, তাহা হইলে আর বন্ধুত্ব টিকিবে না! সাবধান দুণাক্ষরে কখনও অভাবের কথা বন্ধুর কানে তুলিবে না। এই-ভাবে যদি কেহ চলিতে পারে, তাহা হইলে বেশ সুস্থ মনে জীবন কাটাইতে পারিবে, মানুষের উপর ঘৃণা জন্মিবে না!' এখানে আর একটা কথা জানাও আবশ্যক। বাড়ীতে একবেলা খাইয়া, পুত্রকন্যাদের ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইতে দেখিয়া, পীড়িত সন্তানকে বিনা চিকিৎসায় ফেলিয়া রাখিয়া, ভাল কাপড় জামা পরিয়া হাসি-মুখে যদি বন্ধুর সহিত গল্প করিয়া আসিতে পার, তাহা হইলেই বন্ধুত্বের বনেদ পাকা করিয়া গাঁথিয়া তুলিতে পারিবে; নচেৎ তোমার বন্ধুলাভের আশা দুরাশা! ঠাকুর্দ্দার নিশ্চয় এসব কথাগুলো জানা ছিল না। "তিনি প্রতি-ত জ্যৈষ্ঠ মাসে জমিদার-তনয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু টাকার সম্বন্ধে কোন কথা হইল না। প্রায় সপ্তাহ খানেক হাঁটাহাঁটির পর

ঠাকুর্দ্দা কথা তুলিতেই বন্ধুবর কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর্দ্দা প্রায় এক ঘণ্টা বসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। নির্লজ্জ ঠাকুর্দ্দা তারপর আরও দুই তিনবার জমিদার-ভবনে গিয়াছিলেন, কিন্তু জমিদারবাবু কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে মাঝে মাঝে পথে ঘাটে উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে—জমিদার-নন্দন মৃদু হাসিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বন্ধুত্বের জেরটুকু বজায় রাখিয়াছিলেন।"

এই গল্পটা আমাকে বিশেষভাবে শুনাইবার একটা উদ্দেশ্য ঠাকুরমার ছিল।

তবে বেড়ালের মত দুই একজন মানুষের ভাগ্যে যে সিঁকে ছেড়ে না, এমন কথা আমি বলিতে পারি না! কেননা, আমার বন্ধুভাগ্য সত্যই ভাল ছিল। সে কথা ক্রমে বলিতেছি।

[১২]

বৈকালে প্রবন্ধ লইয়া চন্দ্রবাবুর বাড়ী হাজির হইলাম। খাতির দেখে কে! প্রবন্ধ শেষ হইতে যে তখনও কি বিলম্ব ছিল! সেদিন নানাবিধ মিষ্টান্নে আমার রসনা তৃপ্ত হইল। চন্দ্রবাবু বলিলেন, "চলুন সুরেশবাবু থিয়েটার

দেখে আসি ?" চন্দ্রবাবুর অনুরোধ কি উপেক্ষা করিতে পারি ! তখনই সানন্দে রাজি হইলাম। বাড়ীতে যে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক একথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। ঠাকুরমা ও অনিমা যে না খাইয়া সারারাত্রি আমার জন্য ব্যাকুল হইয়া বসিয়া থাকিবে, একথা একবার ভাবিলাম না।

যথাসময়ে থিয়েটারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। চন্দ্রবাবু, তাঁহার আর দুইটি বন্ধু ও আমি—"রাজবাক্স" অধিকার করিয়া বসিলাম। এই সৌভাগ্যে ঝটিকাক্ষুব্ধ সাগর-তরঙ্গের মত উদ্বেল আনন্দে আমার হৃদ্‌সাগর ওতোপ্রোত হইতে লাগিল।

কিছুদূরে দাঁড়াইয়া দুইজন অপরিচিত লোক আমাদেরই সম্বন্ধে কি বলাবলি করিতেছিল। একজনের কথা আমার কানে গেল ;—'ঐ গোঁফ্-কামান মোসাহেবটা আবার কবে জুট্‌ল ?' আমি যেন সে কথা শুনিতে পাই নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটে মনঃসংযোগ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এ ভাবে পরের দৃষ্টি এড়ান যায়, কিন্তু মনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এই কথাগুলো আমার মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধিয়া মাঝে মাঝে পীড়ন করিতে লাগিল।

এমন সময় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই চন্দ্রবাবু উঠিয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন, "এই যে মাষ্টারমশায়, ভাল আছেন ?"

মাষ্টারমহাশয় হাসামুখে কহিলেন, "আছি বাবা, তোমাদের সব খবর ভাল ? এবার অনেক দিন পরে থিয়েটারে এসেছ ?"

চন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন, "কাউন্সিলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তাই এদিকে আশা ঘটে নি।"

দুই একটি কথার পর মাষ্টারমহাশয় সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।

চন্দ্রবাবুর একজন বন্ধু কহিলেন, "ওহে চন্দ্রবাবু, মাষ্টারমশায় খুব রসিক হ'য়ে উঠেছেন যে!"

চন্দ্রবাবু কহিলেন, "কি রকম ?"

বন্ধুটি হাসিয়া কহিলেন, "থিয়েটারেই এখন মাষ্টার মশায়ের ঘর-বাড়ী হ'য়ে উঠেছে। থিয়েটারের সাজ-ঘরের দোরে মাষ্টারমশায় পাহারা দেন। দুই একজন অভি- নেত্রীর সঙ্গে সময় বুঝিয়া একটু-আধটু রসিকতা ক'রে থাকেন।"

চন্দ্রবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "সে কি হে! যেখানে ছেলেদের সভা হয়, সেখানেই যে এঁকে দেখতে পাই

ইনি সংযমের বক্তৃতা দেন, ছেলেদের নৈতিক উন্নতির সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন; না না, উনি কখনও অমন হ'তে পারেন না। লোকে বোধ হয় মিথ্যে করে ওঁর নামে দোষ দেয়।"

অপর এক ব্যক্তি দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল,—বোধ হয় থিয়েটারেরই সম্পর্কিত কেহ হইবে,—ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সে কহিল, "আপনারা বুঝি মাখনমাষ্টারের কথা বলছেন, উনি যে থিয়েটারের মেয়েদের পার্ট শেখান।"

চন্দ্রবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "তাই না কি! রাত্রে বুঝি এখানে চাকরী নিয়েছেন?"

সেই লোকটি কহিল, "ঠিক চাকরী নয়—উনি মাস-কাবারি মাইনে বলে কিছু নেন না, তবে জলখাবারের জন্য দু'চার পয়সা ও যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া থিয়েটার থেকে পান।"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "বলেন কি মশায়, লেখাপড়া-জানা শিক্ষিত গণ্যমান্য একজন শিক্ষক এতটা নীচ হ'তে পারেন?"

লোকটি কহিল, "তাই দেখ্‌ছি ত! শুধু তাই নয়—

তিনি দুই একজন অভিনেত্রীকে নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়েও পার্ট শেখান।”

আমি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলাম, “তাঁর বাড়ীতে বুঝি মেয়েছেলে নেই?”

লোকটি কহিল, “কেন থাক্‌বে না, সবাই আছে,—ওঁর স্ত্রী আছেন, মেয়ে আছে, ভাইয়ের স্ত্রী আছেন, তাহা ছাড়া অন্যান্য মেয়েছেলেও আছে।”

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। এও সম্ভব!

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সেই লোকটি কহিল, “ওঁর বাড়ীর মেয়েছেলেরা খুব উদার! ওঁরা ও সব গ্রাহ্য করেন না। থিয়েটারে যখনই আসেন অভিনেত্রীর সঙ্গে গল্প করেন, তাদের সঙ্গে বসে পান খান, এমন কি বাড়ী যাওয়ার সময় অভিনেত্রীকে এক গাড়ী করে তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যান।”

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক এমনই প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচার করিয়া বেড়াইতেছে,—অথচ কেহ ইহার বিরুদ্ধে একটা কথা বলে না! এই কি আমাদের দেশের শিক্ষার ফল!

পরদিন বিশুকে এই কথা বলিলাম। বিশু দুঃখ করিয়া কহিল, "আমাদের দেশে প্রকৃতি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় এই শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াচ্ছে। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মের যে কোন সম্বন্ধ নাই! আমরা কতক-গুলো বই কণ্ঠস্থ করে পরীক্ষার গণ্ডী উত্তীর্ণ হই বটে, কিন্তু আমাদের প্রকৃত শিক্ষাই হয় না। না হ'লে একজন শিক্ষিত ব্যক্তির এতটা অধঃপতন হয়। শুধু তাই নয়, এই সব লোকই সভা-সমিতেতে মোড়ল সেজে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, গণ্যমান্য চরিত্রবান্ লোকের কাছে এরাই খাতির পায়। যে দিন এই সব চরিত্রহীন ভণ্ডদের প্রকাশ্য সভা থেকে ছেলেরা অপমানিত করে দূর করে দিতে পারবে, সে দিন বুঝব আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষার বীজ উপ্ত হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে! দেখ্ ওই জন্যে আমি কোন সভা সমিতিতে যাই না! সে দিন এক সভায় গিয়ে দেখি একজন নামজাদা লোক সংযম সম্বন্ধে খুব 'লম্বা-চওড়া' বক্তৃতা দিচ্ছে, অথচ ঐ লোকটা এক রাত্রের জন্যও তাহার রক্ষিতাকে ছেড়ে থাকতে পারে না; তাহার বাড়ীতে মা মরুক, ভাই মরুক—তবুও অন্ততঃ দশ পনর মিনিটের জন্যও সে এক-বার রক্ষিতাকে দেখা দিয়ে যাবে। তাকে দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠ্ল। আমার ইচ্ছে হ'ল সেখানে ছুটে

গিয়ে তাকে সভামঞ্চ থেকে নামিয়ে দি! কিন্তু তা ত হবার নয়, তাই সভা ছেড়ে তখনই চলে এলাম।" এই বলিয়া বিশু চুপ করিল।

আমিও খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া আসিলাম। বিশু একটা মানুষ!

বিশুর সহিত আবার পূর্ব্বের মত মিশিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু বড় লোকের বন্ধু সাজিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। প্রতিদিন নিত্য নূতন বেশে চন্দ্র বাবুর সহিত দেখা করিতে যাইতাম; এবং ঘর দোর সাজান লইয়া অনিমাকে তেমনই কষ্ট দিতাম। বিশু, মাঝে মাঝে আমায় বলিত, "বড়লোকের সঙ্গে অত বেশী মেলামেশা ভাল নয়।" আমি তখনই তাহার উপর অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতাম! আমার মনে হইত, বিশুর ঐ একটা মহৎ দোষ,—হিংসা, হিংসা! সে মিশিতে পায় না, তাহাকে চন্দ্রবাবু খাতির করে না, তাই আমার উপর তাহার হিংসা! না হইলে সে কেন বারবার ঐ কথারই উল্লেখ করিবে?...এক এক দিন ইচ্ছা হইত স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ফেলি, 'দেখ্ বিশু চন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে তুই কোন কথা বলতে পাবি নি।' কিন্তু ভয়ে বলিতে পারিতাম না। কি জানি যদি সে রাগ করিয়া লেখা বন্ধ করিয়া দেয়!

এই ভাবে দিন এক রকম কাটিতে লাগিল। মাসের পর মাস আমার লেখার পারিশ্রমিক চন্দ্রবাবুর তহবিলে জমা হইতে লাগিল। ফলে ঠাকুর্দার যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় দিন দিন ক্ষয় হইয়া আসিল! ঠাকুরমার মুখ ভার করিয়া থাকিতেন, অনিমা বিষণ্ণ মুখে ঘুরিয়া বেড়াইত। খরচপত্র সম্বন্ধে আমাকে কেহই কিছু বলিত না।

কিন্তু ঠাকুরমা ও বিশুর মধ্যে যে আমার সম্বন্ধে পরামর্শ চলিত, তাহা মাঝে মাঝে আমি শুনিতে যাইতাম এবং মনে তাহাদের উপর রাগ করিতাম।

একদিন সকাল বেলা বাহিরের ঘরে বসিয়া ভাবিতেছিলাম, আজ কোন্ জামাটা গায়ে দিয়া চন্দ্রবাবুর ওখানে যাইব, এমন সময় একজন সহিস আসিয়া কহিল, "রাজা-সাহেব আপনাকে ডাক্‌ছেন।" সে অবশ্য হিন্দিতে কথা-গুলি বলিল।

আমি লাফাইয়া উঠিলাম। ঠাকুরমা কি জন্যে সেই সময় বাইরের ঘরে আসিয়াছিলেন, আমি ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "ঠাকুরমা শীগ্‌গির ওপর থেকে আমার জামাটা এনে দাও? চন্দ্রবাবু রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন।"

ঠাকুরমা হাসিয়া কহিলেন, "তা অমন হাঁপাচ্ছিস কেন?"

আমার ভারি রাগ হইল, বলিয়া উঠিলাম, "দূর ছাই জামাটা আগে এনে দিয়ে তার পর যত পার হেস ঠাকুরমা।"

আর একজন সহিস আসিয়া কহিল, "বাবুসাহেব, শীগ্‌গির আসুন।"

আমি অস্থির হইয়া দরজার দিকে চাহিয়া রহিলাম। জামা আনিতে এত দেরী! তখন এ কথা ভাবিয়া দেখি নাই ঠাকুরমার ত আর ডানা নাই যে তিনি এক মুহূর্ত্তে জামা লইয়া ফিরিয়া আসিবেন! যাহা হউক জামা আসিল, আমি কোন রকমে গায়ে দিয়া ছুটিয়া গাড়ীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলাম, "দেরী হ'য়ে গেছে মাপ করবেন, তা গাড়ীতে বসে কেন, অনুগ্রহ করে যখন এতদূর এসেছেন গরীবের কুটিরে একবার পায়ের ধূলো দিন।"

চন্দ্রবাবু একখানি পত্র আমার হাতে দিয়া কহিলেন, "আজ আর সময় হবে না, অনেক জায়গায় নেমন্তন্ন করতে হবে!"

আমি অত্যন্ত বিনয় সহকারে কহিলাম, "কি সৌভাগ্য আমার।"

চন্দ্রবাবু কহিলেন, "দেখুন, চিঠিতে লেখা নেই, কিন্তু

সস্ত্রীক আপনার নেমন্তন্ন রইল। আপনার গিন্নীকে নিয়ে যাবেন, ভুলবেন না।”

আমি মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, “নিশ্চয়ই নিয়ে যাব, পরম সৌভাগ্য আমার।”

চন্দ্রবাবু আর কিছু না বলিয়া গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন।

আমি রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া দুই তিনবার পত্রখানি পড়িলাম। তাহাতেও যেন আমার তৃপ্তি হইল না। যাহা হউক পত্রখানি হাতে করিয়া ছুটিতে ছুটিতে বাড়ীর ভিতর গিয়া হাজির হইলাম। সম্মুখেই অনিমাকে দেখিতে পাইলাম, চিঠিখানি তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, “পড়ে দেখ এমন সৌভাগ্য কয়জনের ভাগ্যে ঘটে।”

এমন সময় ঠাকুরমা আসিয়া বলিলেন, “ব্যাপারখানা কি, মুখে যে হাসি ধরছে না?”

আমি বলিয়া উঠিলাম, “আর কি দেখছ ঠাকুরমা, বরাত ফিরে গেছে, শুধু আমার নয়, তোমার নাতবউয়ের শুদ্ধ চন্দ্রবাবুর ওখানে নেমন্তন্ন!” ঠাকুরমা কি বলিতে যাইতেছিলেন, আমি বাধা দিয়া বলিলাম “তুমি ত ঠাকুরমা পাড়ার মেয়েদের সাজিয়ে বেড়াও, কাল সাজিয়ে দিও দেখি তোমার নাতবউকে;—এমন করে সাজাবে যেন চন্দ্রবাবুর বাড়ীর

মেয়েদের পর্য্যন্ত তাক লেগে যায়! তবে বুঝব তোমার বাহাদুরী।"

ঠাকুরমা হাসিয়া কহিলেন, "কেন বউটিকে বুঝি ফিরিয়ে আনবার মতলব নেই—অনুর এই চেহারার ওপর যদি সাজগোজ করে তা হ'লে ফিরিয়ে আনতে পারবি ত?"

আমি হাসিয়া কহিলাম "তোমার ঐরকম কথা! এখন দাও দিকি চিঠিখানা আমায়?"

ঠাকুরমা কহিলেন, "কি করবি, মাদুলী করে গলায় ঝুলোবি না কি?"

আমি বলিলাম, "তোমার সব সময় ঠাট্টা! দাও না চিঠিখানা একবার বিশুকে দেখিয়ে আসি।"

আমি ঠাকুরমার হাত হইতে পত্রখানি লইয়া সেই অবস্থায় বাড়ীর বাহির হইয়া গেলাম, বিশুকে গিয়া সে খানি দেখাইলে সে কহিল, "ভালই ত।"

আমি বলিলাম, "শুধু আমায় নয়, অনুরও নেমন্তন্ন হ'য়েছে, চিঠিতে সে কথা লেখা নেই, চন্দ্রবাবু মুখে বলে গেছেন।" বলিয়া একবার বক্রদৃষ্টিতে বিশুর মুখ দেখিয়া লইলাম। আমার মনে হইল হিংসার আগুনে বিশুর মুখ জ্বলিতেছে। আমার ভারি আনন্দ হইল। জ্বলুক, জ্বলুক

হিংসায় জ্বলুক! এখনই হইয়াছে কি, সারাজীবন হিংসায় জ্বলিতে হইবে।

[১৩]

সেদিন রাত্রে ঘুমাইতে পারিলাম না। পরদিন সকাল হইতে ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কখন সে আকাঙ্ক্ষিত সময় আসিবে। দূর গে ছাই ঘড়ি যে আজ চলিতেই চাহে না,—ঘড়ির কাটা যেন অতি ধীরে ধীরে চলিতেছে। ইচ্ছা হইল কাটা দুটোকে খুব জোরে ঘুরাইয়া দিই। এমনই করিতে করিতে অবশেষে সেই আকাঙ্ক্ষিত সময় ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

তখনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় দুই ঘণ্টা বাকি। আমি নিজে সাজগোজ করিয়া ঝিকে গাড়ী আনিতে পাঠাইয়া ঠাকুরমা ও অনিমাকে নিয়া পড়িলাম। খানিকক্ষণ ঠাকুরমার সহিত বকাবকি করিয়া বাহিরের ঘরে আরসির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম মাথার কোন একগাছি চুল এদিক ওদিক সরিয়া গিয়াছে কি না; মুখের চারিদিকে হাত বুলাইয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিলাম, কোন জায়গা খসখস করিতেছে কি না! এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিল।

পাশে টেবিলের উপর এসেন্সের শিশি ছিল, তাহাই বেশ করিয়া চাদর ও জামায় মাখিলাম। এমন সময় হাত ঘড়ির দিকে দৃষ্টি করিতেই আমি চমকিয়া উঠিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা হইতে চলিল ঝি গাড়ী আনিতে গিয়াছে, এখনও ফিরিল না? ঝি বেটী নিশ্চয়ই কোথায় বসিয়া গল্প করিতেছে। রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বালা করিয়া উঠিল। আসুক বেটী মজাটা টের পাওয়াইয়া দিব। ভাগ্যিস্ ঘুঘণ্টা হাতে রাখিয়া পাঠাইয়াছি। আঃ, ঠাকুরমাও ত ভারি ফ্যাসাদ বাধাইল। সময় যে উত্তীর্ণ হইয়া যায় এ জ্ঞান কাহারও নেই!

আমি চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "ঠাকুরমা ঠাকুরমা কি করছ, এখনও সাজান হ'ল না, সময় যে হ'য়ে এল। দূর হ'কগে ছাই আর পারি না।"

তারপর আমি আপন মনে বলিতে লাগিলাম, "তাই ত, তাই ত, ঝি বেটী এখনও এল না! ঐ বুঝি আস্ছে—গাড়ীর শব্দ হ'চ্ছে না?" শব্দ শুনিবার জন্য আমি উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম, কিন্তু কোথায় গাড়ী!

এমন সময় ঠাকুরমা অনিমার হাত ধরিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনিমা আমায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘোমটা দিতে গেল, কিন্তু ঠাকুরমা কাপড় ও চুলের

সহিত এমনভাবে সেপ্‌টিপিন গুঁজিয়া দিয়াছিলেন যে, অনিমা ঘোমটা দিতে পারিল না, মুখ লাল করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

ঠাকুরমা হাসিয়া কহিলেন, "দেখ, ওরকম লজ্জা করলে ত চল্‌বে না। কোথায় যাচ্ছিস্‌ জানিস ত? সেখানে লজ্জা-টজ্জা চল্‌বে না।"

আমিও তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিলাম, "ঠিকই ত, ও রকম মাথা হেঁট ক'রে সেখানে গেলে ত চল্‌বে না?" ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলাম, "দেখছ ঠাকুরমা ঝির আক্কেল, এক ঘণ্টা হ'তে চল্ল এখনও এল না! বেটাকে আজ তাড়িয়ে তবে অন্য কাজ।"

এমন সময় গাড়ীর শব্দ শ্রুত হইল। "যাক্‌ এসেছে, এখনও এক ঘণ্টার বেশী সময় আছে," এই বলিয়া চাদরখানা ভাল করিয়া গায়ে দিলাম। কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট, গাড়ীর শব্দ যে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া আবার দূরে চলিয়া গেল! আমি হতাশভাবে বাইরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঐ যে ঝি আসিতেছে!

ঝি কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিতেই আমি দাঁতমুখ খিচাইয়া বলিলাম, "গাড়ী কই, গাড়ী কই?"

ঝি কহিল, "গাড়ী পাওয়া গেল না দাদাবাবু।"

রাগে আমার পিত্ত পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। আমি রোষ-কম্পিত কণ্ঠে কহিলাম, "কৃতার্থ হ'লাম, বেটী কোথায় ব'সে গল্প ক'রছিলি? দেড় ঘণ্টা পরে এসে বলা হ'চ্ছে গাড়ী পাওয়া গেল না!"

ঝি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল "দেখ দাদাবাবু অমন বেটী বেটী ক'র না বলছি। আমাকে দিয়ে তোমাদের না পোষায় তোমরা অন্য ঝি দেখ। একবার নিজে বেরিয়ে দেখে এস না কেমন গাড়ী পাও!"

আমি রাগে ফুলিতে ফুলিতে কহিলাম, "গাড়ী পাওয়া যায় কি না দেখ্‌ছি। ফিরে এসে বেটিকে বিদেয় ক'রে তবে অন্য কাজ।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাটীর বাহির হইয়া গেলাম। শুনিতে পাইলাম, ঝি চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "ফিরে আস্‌তে হ'বে কেন, আমি এখনই যাচ্চি।" আরও কত কি সে বলিতেছিল, তাহা শুনিতে পাইলাম না।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিলাম। গাড়ী সত্যই পাওয়া গেল না। সেদিন কোথায় একটা মেলা ছিল, সেখানে প্রায় সব গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। গাড়ীর জন্য এমন নিমন্ত্রণ বাদ পড়িবে? তাহা হইতে পারে না,—তাই আমি একখানা পাল্কী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম।

ঠাকুরমাকে বলিলাম, "তুমি ওকে নিয়ে এস, আমি ততক্ষণ বেহারাদের দু'টো কথা বলে আসি।" বাহিরে গিয়া বেহারাদের বলিলাম, "দেখ তোরা আট আনা ভাড়া চেয়েছিস ত? আমি সেই জায়গায় তোদের বার আনা দেব, কিন্তু একটা কথা, শোয়ারী নিয়ে তোদের আস্তে আস্তে যেতে হবে।"

বেহারারা তাহাদের উড়ে ভাষায় কহিল, "যে আজ্ঞে।"

ঠাকুরমা অনিমাকে পাল্কীতে বসাইয়া দিলেন। বেহারারা পাল্কী তুলিল। আমি মনে মনে দুর্গানাম করিতে করিতে কহিলাম, "কি আপদেই পড়া গেল, সারাদিন ধ'রে জুতো-জোড়াটাকে পরিষ্কার করলাম, একবারে ধূলোয় ধূলো হ'য়ে যাবে!" যাহা হউক দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে পাল্কীর সঙ্গে চলিলাম।

বেহারারা পাল্কী কাঁধে করিয়া সাধারণতঃ যেরূপ হাঁই হুঁই করিতে করিতে ছুটিয়া থাকে, আমার সহিত চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাহারা তেমনই হাঁই-হুঁই করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল।

নিরুপায় আমি প্রথমটা পিছাইয়া গেলাম। শেষ কালে অতি কষ্টে দৌড়িতে দৌড়িতে গিয়া পাল্কী ধরিয়া

ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলাম, "তোদের সঙ্গে কি কথা ছিল আমার ?"

বেহারারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "কথা ছিল তা কি করব, ভারি সোয়ারী কাঁধে করে কি আস্তে আস্তে চলা যায় !"

আমি আরও চটিয়া উঠিয়া কহিলাম, "পারবি নি ত, তখন রাজি হ'য়েছিলি কেন ?"

দুই তিন জন বেহারা বলিয়া উঠিল, "সোয়ারী কাঁধে করে কি দাঁড়ান যায়, চল চল ।"

সর্দ্দার বেহারা আমার কথার উত্তরে বলিল, "স্বীকার হ'য়েছিলাম বলে কি গর্দ্দানা নেবে। এর চেয়ে আস্তে আস্তে আমরা যেতে পারব না।" এই বলিয়া তাহারা আবার পাল্কী লইয়া ছুটিতে লাগিল। আর কিছু বলা নিষ্ফল বুঝিয়া আমিও লোকের ধাক্কা খাইতে খাইতে ছুটিতে লাগিলাম।

এমন সময় কে একজন বলিয়া উঠিল, "মশায় দেখে চলবেন, দেখে চলবেন, একেবারে গায়ের ওপর দিয়ে যে চলেছেন।"

আমি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, "দেখছেন না মশায়, পাল্কীর সঙ্গে আমার যেতে হ'চ্ছে।"

লোকটি রাগিয়া কহিল, "তাই বলে বুঝি আপনি লোকের গায়ের ওপর দিয়ে যাবেন, বেশ মজার লোক ত।"

আমার ভারি রাগ হইল। "যান্ যান্ মশায়" বলিতে বলিতে আমি অগ্রসর হইলাম।

লোকটিকে বলিতে শুনিলাম, "আচ্ছা ভদ্রলোক ত!" সে কথায় তখন কে কান দেয়।

আরও খানিকদূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় একজন ভীমকায় কাবুলিওয়ালা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিল, (অবশ্য তাহার কাবুলি-ভাষায়) "অন্ধ নাকি! মানুষ দেখ্‌তে পাস্ না।"

আমি দেখিলাম বেগতিক, এখন নরম হইলে চলিবে না; উঁচুগলায় কহিলাম, "আমি অন্ধ না তুই অন্ধ, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ নি আমার বড় বড় দুটো চোখ র'য়েছে।"

কাবুলিওয়ালা কর্কশকণ্ঠে কহিল, "চোখ আছে তা আমার কি, মানুষের গায়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছিস্ আর বলা হ'চ্ছে চোখ আছে!"

আমি ভাঙ্গা হিন্দিতে কহিলাম, "আমি কি সাধ ক'রে যাচ্ছি, পাল্কীর সঙ্গে যেতে হ'চ্ছে কি ক'রব।"

কাবুলিওয়ালা লাঠি তুলিয়া কহিল, "তাতে আমার কি, এক ডাণ্ডা কসাব।"

আমারও কি রকম রাগ চড়িয়া গেল, আমি ছড়ি তুলিয়া কহিলাম, "চোপরাও ;" কিন্তু তাহাতে উল্টা ফল হইল, কাবুলীওয়ালা ভয় ত পাইলই না, বরং আমাকে মারিবার জন্য লাঠি তুলিল ; আমি কোন রকমে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম।

সেদিন যে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। আবার ছুটিতে লাগিলাম। খানিক দূর যাইতে না যাইতে সহসা এক ব্যক্তির ধাক্কা খাইয়া একজন স্ত্রীলোকের ঘাড়ে পড়িতে পড়িতে কোন রকমে সামলাইয়া গেলাম। সেই রমণীটির হাতে খাবারের ঠোঙা ছিল, আমার চাদরে বাধিয়া সেই ঠোঙাশুদ্ধ খাবার রাস্তায় ছড়াইয়া পড়িল।

স্ত্রীলোকটি তখনই চীৎকার করিয়া রাস্তার লোক জড় করিল। কি ব্যাপার হইয়াছে, কেহই কিছু জানে না, অথচ চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিয়া আমায় ঘিরিয়া ফেলিল। স্ত্রীলোকটি প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে গো, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, যে মনিব আমার—।"

আমি মিনতি করিয়া বলিলাম, "বাপু চুপ কর চেঁচিও না, কত দাম বল, আমি দিচ্ছি।"

একজন পথিক আমার পক্ষ হইয়া ,কহিল, "উনি দাম দেবেন বল্‌ছেন, তখন তুমি বাছা কেন মিথ্যেমিথ্যি চেঁচাচ্ছ। ক'পয়সার খাবার ছিল গো বাছা ?"

তাহার সেই ছোট ঠোঙাটিতে দুই আনার বেশী খাবার কিছুতেই ধরিতে পারে না, কিন্তু এমন দাঁও কোন্ বুদ্ধিমতী ছাড়িতে পারে ;—সে ফস্ করিয়া বলিল,"পাঁচ আনার খাবার ছিল, তোমাদের বিশ্বাস না হয় দোকানদারকে জিজ্ঞেস৷ ক'রবে চল ?"

মূল্য সম্বন্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া আমি পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিতে গিয়া দেখিলাম, ইতিমধ্যে গাঁটকাটা সেটি হস্তগত করিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ ! আমার যে তখন কি রকম মনের অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। যদি কেহ এরকম অবস্থায় কখনও পড়িয়া থাকেন—সালঙ্কারা যুবতী পত্নীকে লইয়া বেহারারা ছুটিতেছে, এদিকে শতাধিক লোক আমার পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর একজন রমণী অনবরত চীৎকার করিতেছে, এদিকে গাঁট-কাটা মনিব্যাগ লইয়া চম্পট দিয়াছে ; পয়সা দিয়া যে উদ্ধার পাইব, এমন উপায় নাই—তাহা হইলে আমার অবস্থা অবশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

আমি সেই ভদ্রলোকটির দিকে কাতরে চাহিয়া কহিলাম, "মশায় সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, পকেট মেরেছে।"

দাসী সেই কথাটা শুনিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "তা হবে না বাবু, যেখান থেকে হ'ক আমার খাবার কিনে দিতে হবে।"

সেই লোকটি কহিলেন, "দেখুন, আপনি এক কাজ করুন, ওকে সঙ্গে ক'রে বাড়ী নিয়ে গিয়ে পয়সা কটা দিয়ে দিন। পয়সা না পেলে ত ও ছাড়বে না।"

আমি দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিলাম, "মশায় বলেন কি; আমার সঙ্গে যে পাল্কী র'য়েছে!"

তাঁহার কথামত কার্য্য হইল না বলিয়া লোকটি বোধ হয় আমার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি একটু চড়া গলায় কহিলেন, "তাই বলে কি আপনি গরীব-মানুষের পয়সা দেবেন না?"

সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম, পাল্কী অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। দুই হাত জোড় করিয়া কহিলাম, "মশায়, আপনি যদি আমায়—বিপদ থেকে উদ্ধার করেন—আমি বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি কাল পয়সা ক'টা দিয়ে দেব।"

ভদ্রলোকটি কহিলেন, "কোথায় মশায় ও বেচারী আপনার বাড়ী খুঁজে বেড়াবে।"

পাল্কী তখন প্রায় দৃষ্টির বহির্ভূত হইবার উপক্রম করিয়াছে; আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আমি কি চুরি করব না কি?" বলিয়াই ক্ষিপ্রপদে সেস্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে দাসী খপ্ করিয়া আমার চাদরের প্রান্তদেশ ধরিয়া ফেলিল। আমি সজোরে চাদর ধরিয়া টান মারিলাম। চাদর দাসীর হাত হইতে খসিয়া গেল বটে, কিন্তু খানিকটা তাহার হাতে রহিয়া গেল, আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে পাল্কীর অভিমুখে ছুটিলাম। দুই জন পথিক আমার পশ্চাদ্ধাবন করিল বটে, কিন্তু খানিক দূর গিয়া তাহারা থামিয়া গেল।

আমি পাল্কীর নিকটে গিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলাম, "বজ্জাত বেটারা, আমায় ফেলে চলে এলি যে?"

বেহারাগণ কহিল, "গাল দিও না বাবু! তুমি করবে রাস্তার লোকের সঙ্গে দাঙ্গা, আর আমরা সোয়ারী কাঁধে ক'রে দাঁড়িয়ে থাকব!"

আমি চুপ করিয়া গেলাম। পাল্কীর দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত ছিল, তাহারই ফাঁক দিয়া আমি অনিমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সঙ্গে পয়সা কড়ি আছে?"

অনিমা মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আছে।"

আবার চলিতে লাগিলাম। বারবার মনে হইতে লাগিল, 'না—এর চেয়ে ফিরে গেলে হ'ত। চাদরে কাদা মেখে গেল, কাপড় জামা সব তচনচ হ'য়ে গেল, জুতো ধূলোয় ধূলো হয়ে গেল!' কিন্তু ফেরা হইল না। গ্রহ যখন বিরূপ হয় তখন লোকের এইরূপ মতিচ্ছন্নই হইয়া থাকে! যাহা হউক সেই বাঞ্ছিত মহাতীর্থের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম। বেহারাদের বাম দিকে যাইতে বলিয়া মনে মনে আবার দুর্গা দুর্গা বলিতে লাগিলাম।

[১৪]

ফটকের নিকটবর্ত্তী হইয়া আমি জুতাটা রুমাল দিয়া ঝাড়িয়া লইয়া গম্ভীরপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, পাল্কী আমার পাছে পাছে চলিল।

ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইতেই দরোয়ান কহিল, "বাবু টিকিট?"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "টিকিট! টিকিট কিসের?"

দরোয়ান কহিল, "বাবুজি ভুল হ'য়েছে—টিকিট না, নেমন্তন্নের চিঠি।"

আমি ব্যগ্র হইয়া বলিলাম, "কোন্ চিঠি?"

দরোয়ান কহিল, "নেমন্তন্নের চিঠি।"

আমি দরোয়ানের মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, যদি চেনা দরোয়ান হয়! কিন্তু হায় দুরদৃষ্ট-ক্রমে এ দরোয়ানটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত! পত্রখানি ত আমি সঙ্গে করিয়া আনি নাই! সেখানি যে আমি বিশেষ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি! আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া দরোয়ান কহিল,"চিঠি না হ'লে বাবু আমি ত আপনাকে ঢুকতে দিতে পারি না।"

চোখে আমি অন্ধকার দেখিলাম। কি করি! মনে পড়িল, সত্যই চিঠির তলায় লেখা ছিল, "দ্বারদেশে প্রদর্শনীয়।" এখন উপায়! এদিকে বেহারাগণ হৈ-চৈ বাধাইয়া দিল; তাহারা পাল্কী লইয়া আর দাঁড়াইতে পারে না। তাহাদের বক্‌সিসের প্রলোভন দেখাইয়া কোন রকমে ঠাণ্ডা করিলাম। এখন ফটক পার হইবার কি করি? দরোয়ানের নিকট কাকুতিমিনতি ছাড়া অন্য গতি নাই! চোখ-কান বুজিয়া সেই চেষ্টাই করিলাম; কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ দরোয়ানকে কিছুতেই টলাইতে পারিলাম না।

এমন সময় একখানা মোটর আসিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইতেই দরোয়ান সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া ফটক

খুলিয়া দিল। আমি দরোয়ানকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কই ও বাবুর কাছে ত চিঠি চাইলে না ?"

দরোয়ান গোঁফে চাড়া দিয়া কহিল, "ও সব বড়লোকের কথা আলাদা।"

পিছন দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পাল্কী নাই। সব বেটারা মিলিয়া দেখিতেছি আজ আমায় পাগল না করিয়া ছাড়িবে না! আমি তখন পাল্কীর সন্ধানে ছুটিলাম। একটু দূরে যাইতেই দেখিলাম, বেহারারা রাস্তার এক পাশে পাল্কী নামাইয়া হাওয়া খাইতেছে। আমি তাহাদের উপর খুব চোটপাট করিতে লাগিলাম। তাহারাও ছাড়িয়া কথা বলিল না, কহিল, "তোমায় দেবে না ঢুকতে, আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি ক'রব!"

আমি মাথা ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিয়া দেখিলাম, বেহারাদের কোন অপরাধ নাই। তাহারা ঠিকই বলিয়াছে। হায়, তখন যদি ফিরিতাম! কিন্তু স্থির করিলাম, একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি ফটকের নিকট কাহাকে দেখিতে পাই। সেই আশায় আবার ফটকের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

দরোয়ান কহিল, "কেন বাবু মিছে ঘুরে বেড়াচ্ছ, চিঠি না হ'লে আমি কিছুতেই ঢুকতে দেব না।"

এমন সময় দেখিলাম, চন্দ্রবাবুর খুড়তুতো ভাই শ্যামবাবু ফটকের দিকে আসিতেছেন। আমার ভারি আশা হইল; আমি দরোয়ানকে কহিলাম, "শ্যামবাবু বললে ত ছেড়ে দেবে দরোয়ানজী ?"

দরোয়ান কহিল, "কেন ছাড়ব না; আলবৎ ছাড়ব।"

শ্যামবাবু নিকটে আসিতেই আমি বলিলাম, "নমস্কার শ্যামবাবু।"

তিনি একবার আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন, তার পর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

আমার মনে হইল, "মা বসুন্ধরা তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।"

মানুষ আর কত সহ্য করিতে পারে! আমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া পাল্কীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া বেহারাদের কহিলাম, "চল্ বাড়ী।"

বেহারারা কহিল, "না বাবু আমরা কোথায় যেতে পারব না। তুমি বাবু সোয়ারী নামিয়ে নিয়ে আমাদের ভাড়া চুকিয়ে দাও।"

আমার অসহ্য বোধ হইল, আমি রাগিয়া কহিলাম, "বাড়ী পৌছে না দিলে এক পয়সাও ভাড়া পাবি নি।"

বেহারারা বলিয়া উঠিল, "জোর না কি ? একি মগের

মুলুক পেয়ছে যে জোর ক'রে নিয়ে যাবে। আমরা যেতে পারব না।"

আমি আরও চটিয়া উঠিয়া কহিলাম, "বেটাদের ভারি লম্বা লম্বা কথা। সোজায় না যাস্ মারের চোটে যাবি।"

বেহারারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কি বাবু, মারবে? এখনই পাহারাওলা ডাকব।" এই বলিয়া তাহারা কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া 'পাহারাওলা পাহারাওলা' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

এ আবার কি নূতন বিপদ! আমার রাগ কোথায় চলিয়া গেল। আমি নরম সুরে কহিলাম, "দোহাই তোদের, থাম।"

কিন্তু তাহারা কি থামে! সদ্দার বেহারা বলিয়া উঠিল, "থামব কেন,—তুমি মারবে আর আমরা চুপ করে মার খাব!" বলিয়া সে আবার 'পাহারাওলা পাহারাওলা' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল!

দেখিলাম, নরম হইলে চলিবে না। আমি পুনঃরায় রাগ প্রকাশ করিয়া কহিলাম, "বেটারা চেঁচাচ্ছিস্ কেন, তোদের কি মেরেছি যে অমন ষাঁড়ের মত চীৎকার ক'র্‌ছিস্।"

বেহারা কহিল, "তুমি ত মারবে বল্‌লে।"

আমি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলাম, "বেটারা দেখছি

আমায় পাগল না করে ছাড়বে না ! আরে বেটা মারব বলেছিলাম, মারি নি ত। তার জন্যে তোদের কাছে ঘাট মান্‌ছি—দোহাই তোদের আর চেঁচামেচি করিস্ নি।”

বেহারারা ত আপাততঃ চুপ করিল। আর আমি 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

এমন সময় ভাগ্যলক্ষ্মী কেন যে হঠাৎ আমার উপর সুপ্রসন্ন হইলেন, তাহা তিনিই জানেন। দেখিলাম, চন্দ্রবাবু সেই রাস্তা দিয়া বাড়ীর দিকে আসিতেছেন।

আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলাম, “নমস্কার চন্দ্রবাবু, আপনি কোথায় গেছলেন ?”

চন্দ্রবাবু কহিলেন, “একটা বিশেষ কাজ ছিল ; তা আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন ; ভেতরে চলুন ?”

মিথ্যা কথা বলিতে আমি দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলাম ; তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিলাম,“এই মশায়, বেহারারা পাল্কী নামিয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, তাই দাঁড়িয়ে আছি।”

“আচ্ছা তা হ'লে আপনি আসুন, আমি এগুলাম।” বলিয়া তিনি ফটকের দিকে অগ্রসর হইতেই আমি মহাব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, “একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান।”

তিনি চলিতে চলিতে কহিলেন, “বড় দেরী হ'য়ে গেছে, আর দাঁড়াতে পারব না ; আপনি আসুন না।”

আমি মনে মনে কহিলাম, "আসুন না বললেই যদি আসা যেত, তা হ'লে আপনাকে দাঁড়াতে বলব কেন।" প্রকাশ্যে কহিলাম, "চিঠি আন্‌তে ভুলে গেছি মশায়, দরোয়ানকে যদি বলে দেন।"

"আচ্ছা," বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমি শঙ্কিতহৃদয়ে বেহারাগণকে পাল্কী তুলিয়া ফটকের দিকে অগ্রসর হইতে বলিলাম। বেহারারা বিনা আপত্তিতে পাল্কী উঠাইল। ফটকের কাছে পৌঁছিলে আমার বুকটা আবার কাঁপিয়া উঠিল! এবারও যদি দরোয়ান ভিতরে প্রবেশ করিতে না দেয়? কিন্তু আমার সমস্ত উদ্বেগ ও আশঙ্কা দূর করিয়া দরোয়ান হাসিয়া কহিল, "যান বাবুজী, পাল্কী নিয়ে ভিতরে যান।"

[১৫]

অত্যন্ত আরামে আমার নয়নদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল। অল্পক্ষণ পরে আমি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চারিদিক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। হঠাৎ আমার অত্যাশ্চার্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গেল! এই একটু পূর্ব্বে পা যেন আমার চলিতে চাহিতেছিল না, দেহের ভার-বহনে অসমর্থ হইয়া একেবারে নুইয়া পড়িতেছিল,

কিন্তু ফটক উন্মুক্ত হইবামাত্র সেই পদযুগলই এখন সদর্পে আমাকে ফটক পার করিয়া লইয়া গেল। আমার মুখও সহসা আশ্চর্য্য রকম গম্ভীর হইয়া উঠিল।

প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে বহুলোক সমবেত হইয়াছে। বেহারারা এক পাশে পাল্কী নামাইলে আমি অনিমাকে বলিলাম, "নেমে এস ?"

অনিমা সঙ্কুচিত হইয়া পাল্কী হইতে নামিয়া লোকসমাগম দেখিয়া মুখ নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "দাও দিকি, তোমার কাছে কি আছে, ভাড়াটা চুকিয়ে দিই।"

অনিমা কম্পিত হস্তে রুমাল খুলিয়া পয়সাগুলো আমায় দিতেই, আমি বলিয়া উঠিলাম, "এ ক'টা পয়সায় কি হবে, আর নেই ?"

অনিমা অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আর ত' নেই, ঐ চার আনাই সঙ্গে করে এনেছিলাম।"

আমি দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিলাম, "ও চার আনা দিয়ে কি আমার পিণ্ডি দেব! যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন বল্‌তে পার নি ?"

অনিমা ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে কহিল, "তুমি ত আমায় জিজ্ঞেস কর নি কত আছে ?"

আমি দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলাম, "জিজ্ঞেস করব আমার মাথা আর মুণ্ডু—ও চার আনা তোমার শ্রাদ্ধের জন্য রেখে দিলেই পারতে! কি বিপদেই পড়লাম, এখন ভাড়া দিই কোত্থেকে!"

অনিমা মৃদু কণ্ঠে কহিল, "তুমি কি কিছু সঙ্গে আন নি?"

আমি ক্ষিপ্ত হইয়া কহিলাম, "তুমি মনে করে দাও নি, তাই আনতে ভুলে গেছি! টাকাগুলো তোমার-আমার শ্রাদ্ধের জন্যে রেখে এসেছি! দূর হ'ক গে ছাই এখন বার আনা পাই কোত্থেকে।"

বেহারারা অমনই বলিয়া উঠিল, "বার আনা কি বাবু! দু টাকা দিতে হবে।"

আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু কোন-রকমে রাগ সামলাইয়া কহিলাম, "আচ্ছা দু টাকাই দেব,—তা তোরা এক কাজ কর, কাল সকালে আমার বাড়ী গিয়ে ভাড়া নিয়ে আসিস্।"

বেহারারা কহিল, "সে হবে না বাবু—সে আমরা পারব না। এখনই আমাদের ভাড়া চুকিয়ে দিতে হবে; ও কথা আমরা শুন্‌চি না।"

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলাম, "শুন্‌বি নি ত এক পয়সাও ভাড়া পাবি নি।"

বেহারারা বলিয়া উঠিল, "ভাড়া পাব না বৈ কি। দাও ভাড়া বলছি।"

আমি আবার নরম হইয়া কহিলাম, "বেটারা ভাড়া দেব দেব, চুপ কর, এখন চুপ কর!"

হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিলাম, অল্প কিছু দূরে বিশু দাঁড়াইয়া আছে! আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। এখানে বিশু কি করিয়া আসিল! কি সর্ব্বনাশ!—

এমন সময় চন্দ্রবাবুর শ্যালককে দেখিতে পাইলাম, তাহাকে কম্পিত কণ্ঠে কহিলাম, "মশায় বড় বিপদে পড়েছি;—গোটা দুই টাকা যদি আমায় দেন?"

"দেখছি!" বলিয়া তিনি একবার বক্রদৃষ্টিতে অনিমার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেলেন।

বেহারারা হাঁকিল, "আমরা আর দাঁড়াতে পারব না, ভাড়া চুকিয়ে দাও বাবু।"

আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল! হে ভগবান কি করি! বেহারারা ভাড়ার জন্য কটু কথা বলিতেছে—অনিমা বহুলোকের অপাঙ্গ দৃষ্টির লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে, অদূরে দাঁড়াইয়া বিশু

তাহার অন্তরের হিংসা-বৃত্তির চরিতার্থ করিয়া উৎফুল্ল হইতেছে! কোথায় যাই, কি করি?

চোখ তুলিতেই দেখিলাম, সম্মুখে চন্দ্রবাবু! আমার দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। আমি বলিলাম, "চন্দ্রবাবু বড় বিপদে পড়েছি,রাস্তায় আসতে আসতে ব্যাগটা কে তুলে নিয়েছে, পাল্কীর ভাড়াটা যদি অনুগ্রহ ক'রে দিয়ে দেন।"

চন্দ্রবাবু কহিলেন, "কত ভাড়া? সরকারমশায়কে বল্‌ছি দিয়ে দিতে।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, কিন্তু প্রায় মিনিট দশেক অতিবাহিত হইয়া গেল—চন্দ্রবাবু কিম্বা তাঁহার সরকার কাহারও দেখা পাইলাম না।

বেহারাগণের সত্যই অসহ্য বোধ হইল, তাহারা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা জোচ্চর বাবু ত। ভাড়া দেবার ক্ষমতা নেই ত পাল্কী চড়েছিলে কেন?"

আমি চোখে অন্ধকার দেখিলাম! বিশু আসিয়া যদি আমার হাতখানি তখনই সস্নেহে চাপিয়া না ধারত, তাহা হইলে হয় ত আমি পড়িয়া যাইতাম।

বিশু কহিল, "পাল্কীর কত ভাড়া রে সুরো?"

আমি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম! দু ফোঁটা চোখের জল টপ্ করিয়া মাটির উপর পড়িল।

বিশু তখন বেহারাদের জিজ্ঞাসা করিল, "কত ভাড়া হ'য়েছিল তোদের ?"

আমি ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "বার আনা, ওরা এখন দু'টাকা চাইচে !"

বিশু তৎক্ষণাৎ তিনটি সিকি বাহির করিয়া একজন বেহারার হাতে ফেলিয়া দিতেই সে বলিয়া উঠিল, "রেখে দাও বাবু তোমার বার আনা, দু' টাকার কম নেব না ।"

বিশু ধমক দিয়া কহিল, "ফের যদি বজ্জাতি করবি, এখনই মেরে এখান থেকে বিদেয় করব ।"

বেহারারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে পাল্কী কাঁদে তুলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল ।

বিশু কহিল, "বউমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস্ কেন ? ভেতরে পাঠিয়ে দে ।"

আমি অসহায় দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। এতক্ষণ অনিমাকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছি, চন্দ্রবাবুর কত আত্মীয়স্বজন, এমন কি চন্দ্রবাবুও আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু কই, কেহ ত একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন না ! কিন্তু আমার পর আর চারিজন ভদ্রলোক স্ত্রী ও কন্যা লইয়া আসিলেন, সকলে তাঁহাদের সমাদর করিয়া

ভিতরে লইয়া গেলেন! হায় রে, আমি তখন বুঝিতে পারি নাই,—চন্দ্রবাবুর সহিত আমার যে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ!

যাহা হউক অবশেষে একজন ঝি আসিয়া অনিমাকে উপরে লইয়া গেল, আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

এমন সময় চন্দ্রবাবু আসিয়া বলিলেন, "আপনি কি পর হ'য়ে গেলেন না কি সুরেশবাবু যে, এখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন, ভেতরে বস্‌বেন চলুন?"

কি মোহিনী শক্তি রে! আমি একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলাম। চন্দ্রবাবুর উপর রাগের লেশমাত্র রহিল না। আমি একবার বিশুর মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া চন্দ্রবাবুর সহিত সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

চন্দ্রবাবু যে ঘরে আমায় বসাইলেন, সেই ঘরটিতে পনর কুড়ি জন মাত্র লোক ছিল। তাঁহারা সকলেই ময়ূরের মত পেখম মেলিয়া বসিয়া ছিলেন, আর আমি ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাকের মত তাহাদের মধ্যে গিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বসিলাম!

চন্দ্রবাবুর তকমা-আঁটা ভৃত্যগণ অনবরত বরফ লেমনেড জোগাইতেছিল। খানিক পরে আমার জল তৃষ্ণা পাওয়ায় একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলাম, "এক গ্লাস বরফ লেমনেড আন্ ত।"

সে দিন বড়লোকের ভৃত্যদের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিলাম! তাহারা ঠিক আমায় দাঁড়কাক বলিয়া ধরিয়া ফেলিল! ভৃত্যটি আমার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি আরও গম্ভীর হইয়া কহিলাম, "দাঁড়িয়ে রইলি যে, বরফ লেমনেড নিয়ে আয়।"

ভৃত্যটি বলিয়া উঠিল, "বাবু অত ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন, দিচ্ছি এনে।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু আর ফিরিল না।

তৃষ্ণায় আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছিল। আর বরফ লেমনেডে কাজ নেই, এক গেলাস জল পাইলেই রক্ষা পাই।

আমি আর একবার ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলাম, "বাপু এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার?"

ভৃত্যটী কহিল, "আন্‌ছি বাবু," এই বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে আর একজন বাবু হাঁকিয়া কহিলেন, "এক গ্লাস বরফজল।" ভৃত্য তাঁহাকে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। অবিলম্বে সে এক গ্লাস জল লইয়া ফিরিয়া আসিল; কিন্তু সে জল আমার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নহে! আমি মর্ম্মাহত হইয়া বসিয়া রহিলাম।

প্রতিজ্ঞা করিলাম, তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া গেলেও আর জল চাহিব না।

কোন রকমে প্রায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত করিলাম। এখানে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল না,—চা লেমনেড, পান চুরুটের ও গান শুনিবার নিমন্ত্রণ। একে একে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমি শূন্যকক্ষে বসিয়া রহিলাম।

[১৬]

খানিক পরে চন্দ্রবাবু আসিয়া কহিলেন, "প্রায় ন'টা বাজে—আমার খাওয়ার সময় বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, আর বসতে পারি না, আপনি তাহ'লে এখন বাড়ী যান, কাল দেখা করবেন।"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়নম্রস্বরে কহিলাম, "সত্যি আপনার ভারি কষ্ট হ'য়েছে; আপনাকে আর বিরক্ত করব না। অনুগ্রহ করে যদি দরোয়ানকে একখানা গাড়ী ডেকে দিতে বলেন।"

চন্দ্রবাবু কহিলেন "ওঃ, আপনার স্ত্রীও যে রয়েছেন", এই বলিয়া তিনি দরোয়ানকে ডাকিয়া গাড়ীর কথা বলিতেই সে কহিল, "একখানা গাড়ী দরজায় হাজির আছে।"

চন্দ্রবাবু কহিলেন, "তা হ'লে আপনি একটু বসুন, আমি আপনার স্ত্রীকে ডেকে এনে দি।"

আমি বলিলাম, "যে আজ্ঞে।"

তিনি চলিয়া গেলেন; প্রায় মিনিট দশেক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনার স্ত্রী ত ভেতরে নেই, চলে গেছেন।"

আমি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলাম, "বলেন কি মশায়! চলে গেছে! কোথায়? কার সঙ্গে? না না চন্দ্রবাবু, আপনি আমায় পরিহাস করছেন।"

চন্দ্রবাবু কহিলেন, "পরিহাস কেন করব।"

আমি ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "তা হ'লে আপনি নিশ্চয়ই ভাল করে খোঁজ করেন নি।"

চন্দ্রবাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ভাল ক'রে না খুঁজে কি আপনাকে বলেছি। ওপরে বাইরের কোন মেয়েছেলে নেই।"

আমি আড়ষ্ট হইয়া কহিলাম, "নেই ত, আমার স্ত্রী গেল কোথায়?"

চন্দ্রবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "যাবেন কোথায়, বাড়ীই গেছেন।"

আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, "কার সঙ্গে গেল

চন্দ্রবাবু ? আপনার বাড়ীর মেয়েরা তাঁকে গাড়ীতে উঠতে দেখেছেন ?"

চন্দ্রবাবু বিরক্তিভরে কহিলেন, "কে কখন্ গেল তা কি খোঁজ রাখা সম্ভব ! যখন ওপরে নেই তখন বাড়ী ছাড়া আর যাবেন কোথায় ।"

আমি হতাশভাবে কহিলাম, "তা হ'লে কি করব চন্দ্রবাবু ?"

চন্দ্রবাবু কহিলেন, "করবেন আবার কি, বাড়ী যান !"

আমি কাঁদকাঁদ হইয়া বলিলাম, "আপনি বুঝতে পারচেন না চন্দ্রবাবু। সে ত আপনাদের বাড়ীর মেয়েদের মত শিক্ষিতা নয়—সে পথঘাট কিছুই চেনে না।—পর-পুরুষের সামনে মুখ তুলে সে চাইতে পারে না !—সে কি করে একলা বাড়ী যাবে ! চন্দ্রবাবু এমন সর্ব্বনাশ মানুষের হয় !"

চন্দ্রবাবু ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "না মশায়, আপনার সঙ্গে আমি আর বক্‌তে পারি নে, আমি ওপরে চল্‌লাম আপনি যা হয় করুন।" এই বলিয়া তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। আমি পাষাণ-মূর্ত্তির মত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অবশেষে বাড়ীর একজন ভৃত্য একরকম জোর করিয়া

আমায় বাটীর বাহির করিয়া দিল। আমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলাম। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। আঁধার, গভীর আঁধার চারিদিক হইতে আমায় ঘিরিয়া ফেলিল। আমি একটা রকের উপর বসিয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ পরে ঠিক বলিতে পারি না, পাহারাওয়ালার ধাক্কা খাইয়া আমি সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। একে একে সব কথা আমার মনে পড়িল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম! কি করিলাম! কি করিয়া এখন লোকের কাছে মুখ দেখাইব! আমি মনে মনে বলিয়া উঠিলাম, "ওরে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক, তোর উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে! আর কেন, সম্মুখে গঙ্গা, তাহারই পবিত্র সলিলে দেহ বিসর্জ্জন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত কর।" একবার মনে হইল, যদি সত্যই অনিমা গৃহে ফিরিয়া থাকে? কিন্তু তাহা যে অসম্ভব। সে যে লজ্জানম্র গৃহস্থ-বধূ, কোনদিন একলা ঘরের বাহির হয় নাই, সে কি করিয়া একলা বাড়ী ফিরিতে সাহস করিবে! স্থির করিলাম, তবু একবার শেষ সংবাদ লইয়া দেখিব। এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে কম্পিত চরণে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

বাড়ীর দরজার সম্মুখে গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। কি করিয়া দরজায় ধাক্কা দিব! হাত যে উঠিতেছে না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কম্পিত হস্তে দরজায় ধাক্কা দিতেই, দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ঠাকুরমা আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "হ্যাঁরে এত রাত্রি! কখন্ থেকে আমি তোদের জন্যে দরজা খুলে বসে আছি। কই রে, পাল্কী কই? পাল্কীর ত কোন হাঁক-ডাক শুনলাম না। অনুকে নিয়ে হেঁটে এলি না কি?"

আমি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া ঠাকুরমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। আমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিতেছিল।

ঠাকুরমা হাসিয়া কহিলেন, "বলি, আর অত লজ্জাতে কাজ কি। সারা রাস্তা মেম সাজিয়ে হাঁটিয়ে আন্‌তে পারলি, আর যত লজ্জা আমার কাছে!"

আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। ঠাকুরমা আমার দিকে না চাহিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "তাকে টেনে না আন্‌লে সে দেখছি আর আস্‌বে না।"

আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম "কোথায় যাচ্ছ ঠাকুরমা—সে আমার সঙ্গে আসে নি।"

ঠাকুরমা থমকিয়া দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি ঠাট্টা করিস্ ?"

আমি কহিলাম, "ঠাকুরমা ঠাট্টা নয়, সত্যি আমি তাকে জমিদার-বাড়ী হারিয়ে এসেছি।"

ঠাকুরমা গালে হাত দিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ, বলিস্ কি রে! কি সব্বনেশে কথা, এমন ত কোথাও শুনি নি। তা হ'লে কর্ত্তাকে এখনই ডাকি।"

আমি বলিয়া উঠিলাম; "না, না ঠাকুরমা, তাঁকে আর ডেক না—এ মুখ তাঁকে দেখাতে পারব না—গঙ্গার জলে আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।"

ঠাকুরমা কহিলেন, "সে ত পরের কথা। এখন বৌটার ত খোঁজ করতে হবে।"

আমি হতাশভাবে কহিলাম, "কোথায় খুঁজবে ঠাকুরমা, এতবড় সহরের কোথায় খুঁজে বেড়াবে!"

ঠাকুরমা বিরক্ত হইয়া কহিলেন; "তবে কি তুই বলতে চাস আমরা চুপ ক'রে বসে থাকব! তার একবার খোঁজও করব না। অমন লক্ষ্মী মেয়ে আর একটি হয় রে!" বলিতে বলিতে ঠাকুরমা অঞ্চলে চোখ ঢাকিলেন। একটু পরে আবার কহিলেন, "তোর ত সে আপদ ছিল! এতে তুই খুব খুসী হ'য়েছিস্ দেখছি, না হ'লে খুঁজতে বাধা দিস্ ?"

আমি গাঢ়স্বরে কহিলাম, "ঠাকুরমা, তোমায় সত্যি বলছি তাকে আমি বড় ভালবাসতাম।"

ঠাকুরমা কহিলেন, "মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা! না হ'লে তুই তার সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করিস, দিন রাত্রি কেবল গালাগালি!"

আমি কহিলাম, "ঠাকুরমা তাকে না বুঝে বকেছিলাম, কিন্তু তাকে আমি সত্যিই ভালবাসতাম!"

ঠাকুরমা কহিলেন, "ও সব তোর বাজে কথা।—নইলে তুই আজ নেমন্তন্ন-বাড়ী গিয়েও তাকে গালমন্দ দিস্!"

আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম "ও কথা তোমায় কে বললে ঠাকুরমা।" পরক্ষণেই বিশুর কথা মনে পড়িতেই থামিয়া গেলাম। এ বিশুরই কাজ!

ঠাকুরমা বিষণ্ণমুখে কহিলেন, "সে মনের দুঃখে কোথায় চলে গেছে। কত অপমান মানুষ সইতে পারে!"

আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। ঠাকুরমা মুখ ফিরাইলেন, মনে করিলাম, আমার দুঃখ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। আমি ক্রন্দনজড়িত স্বরে কহিলাম, "ঠাকুরমা আমি সত্যি বল্‌ছি—সে যদি দুঃখে অপমানে আত্মহত্যা করে থাকে, তা হ'লে আমি গঙ্গায় ডুবে মরব।"

ঠাকুরমা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আর অততে

কাজ নেই। ওরে আমি ওসব খুব বুঝি, মুখে ঐ কথা বলছিস বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবছিস্, আপদ বিদেয় হ'য়েছে ; আর তোর সঙ্গে মিছিমিছি ব'কে সময় নষ্ট করতে পারি না। মেয়েটার ত খোঁজ করতে হবে।"

তখন কক্ষে একটি আলো অত্যন্ত মৃদু-মৃদু জ্বলিতেছিল। ঠাকুরমা আলোটি উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সহসা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

সেই আলোকোদ্ভাসিত কক্ষের দ্বারের দিকে চাহিতেই আমি চমকিয়া উঠিলাম! আমার বক্ষঃস্থল দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। কে ও? অনিমার ছায়ামূর্ত্তি? ভয়ে আমার চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল, আমি ভগ্নকণ্ঠে ডাকিলাম, "ঠাকুরমা, ঠাকুরমা।"

ঠাকুরমা সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "কি রে, কি হ'য়েছে, অমন করছিস্ কেন?"

আমি চক্ষু বুজিয়া কহিলাম, "দরজার পাশে কার চেহারা দেখলাম।"

ঠাকুরমা হাসিয়া কহিলেন, "এই না তুই তাকে খুব ভালবাসতিস! আমার নাতবৌটিকে যে একেবারে চিন্তেই পারলি না।"

আমি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া দরজার দিকে চাহিতেই

দেখিলাম, ঠাকুরমা অনিমার হাত ধরিয়া আমার দিকে টানিয়া আনিতেছেন।

আমি অবাক্ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলাম, "কি ক'রে এল ঠাকুরমা ?"

ঠাকুরমা কহিলেন, "ও পাড়ার বরদার স্ত্রীরও নিমন্ত্রণ ছিল, সে তার গাড়ী করে ওকে বাড়ী পৌছে দিয়ে গেছে। বেচারী কি বিপদেই পড়েছিল,—পাঁচবার ঝিকে নীচে খবর দিতে বললে—তা বড়লোকের ঝি তার কথা কানেও তুললে না। দিদির আমার সেখানে সারাক্ষণ জলতেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে; তবু একফোঁটা জল অবধি কেউ খেতে দেয় নি। এমন কি তার সঙ্গে একটা কথা অবধি কেউ বলে নি! যত সব বড় বড় লোকের ঝি বউ এসেছিল তাঁদের নিয়েই সবাই ব্যস্ত। দেখ্, ঢের হ'য়েছে আর দাঁড়কাক হয়ে ময়ূরপুচ্ছ গুঁজে ময়ূর সাজতে যাস্ নি। এখন নাক-কান-মলা খেয়ে চুপ ক'রে শুগে।"

আমি তখনই দুই কানে হাত দিয়া কহিলাম, "ঠাকুরমা এই নাকে কানে খত দিচ্ছি, আর কখনও ময়ূর সাজতে যাব না। যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে।"

সে রাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। অবশ্য একাকী নহে,—অনিমাও আমার সঙ্গে জাগিল। যেন কতদিন

বিরহের পর পতিপত্নীর সাক্ষাৎ হইয়াছে, আমাদের কথা যেন ফুরাইতে চাহে না!

অনিমা ভোর বেলায় আমার বুকে মাথা রাখিয়া কহিল, "আর আমায় অমন করে ব'ক না!"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "ভূত ছেড়ে গেছে—আমি কি তোমায় ব'কতে পারি!"

[১৭]

বেলা প্রায় আটটার সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিল। আমি ঠাকুরমাকে গিয়া বলিলাম, "চল ঠাকুরমা আজ গঙ্গা নেয়ে আসি।"

ঠাকুরমা কহিলেন, "চল, বিশুকে ডেকে নিয়ে আয়. ওরে অমন বন্ধু আর পাবি নি।"

আমি কহিলাম, "সত্যি ঠাকুরমা; আমি এখনই তাকে ডেকে আনছি।"

অনেকের মুখে শুনিয়াছি এবং আমি নিজেও একবার দেখিয়াছি, ভূত কাহারও স্কন্ধে ভর করিলে, শীঘ্র যাইতে চাহে না! হয় ত কোন এক ওঝা আসিয়া ভূতটাকে কাঁধ হইতে নামাইয়া দিয়া যায়; কিন্তু ওঝা বাটীর বাহিরে

যাইতে না যাইতেই, ভূত আবার আসিয়া স্কন্ধে চাপে, সেবার তাহাকে তাড়ানও বড় শক্ত হয়!

যাক্, আমরা চারিজনে গঙ্গাস্নানে বাহির হইলাম। ঘাটে পৌঁছিয়া, ঠাকুরমা ও অনুকে মেয়েদের ঘাটে পৌঁছাইয়া দিলাম। আমরা দুই জনে পাশের ঘাটে স্নান করিতে গেলাম। সে দিন হাবড়ার পোল খোলা;— তাই ঘাটের পাশে পান্‌সির হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। আমরা রানার উপর দাঁড়াইয়া সেই ভিড় দেখিতে-ছিলাম, খানিকপরে চমকিয়া দেখিলাম, মেয়েদের ঘাটের ঠিক পাশেই একখানি পান্‌সিতে চন্দ্রবাবু ও তাঁহার সরকার! আনমা তখন স্নান করিয়া ঘাটের সিঁড়ির উপর সিক্তবসনে দাঁড়াইয়া চুল মুছিবার জন্য গামোছা নিঙ্‌ড়াইতে ছিল।

পাছে চন্দ্রবাবু আমাকে দেখিতে পান এই ভয়ে আমি বিশুর পিছনে গিয়া দাঁড়াইলাম!

চন্দ্রবাবুর পান্‌সি ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া গেল; কিন্তু খানিকদূর যাইয়াই আবার ঘাটে ফিরিয়া আসিল। চন্দ্রবাবু নৌকায় বসিয়া রহিলেন, সরকার মহাশয় তীরে নামিল। পান্‌সি আবার জলে ভাসিল।

বিশু আর আমি তখন তাড়াতাড়ি চার পাঁচটি ডুব

দিয়া উঠিয়া পাড়লাম। গাড়ী লইয়া মেয়েদের ঘাটের নিকট গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলাম, চন্দ্রবাবুর সরকার ঘাটের এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি চোখ ফিরাইয়া লইলাম।

অনিমাকে লইয়া ঠাকুরমা গাড়ীতে উঠিলেন। বিশু গাড়ীর কোচবাক্সে গিয়া বসিল। আমি গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি, এমন সময় সরকার মহাশয় গাড়ীর নিকটে আসিয়া কহিল, "এই যে সুরেশবাবু, বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে বুঝি গঙ্গা-নাইতে এসেছিলেন?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, কোন উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলাম, "হাঁকাও।" কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া আমার ভারি আনন্দ হইল;—চন্দ্রবাবুর কর্ম্মচারী বুঝিয়া গেল, হাঁ, সুরেশবাবু একজন মানুষ বটে!

বিশুকে সেদিন ঠাকুরমা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সারাদিন সকলের খুব আনন্দে কাটিল।

অনিমা প্রতিদিনই ঘুম হইতে আগে উঠিত। ইহার পর দিনও সে উঠিয়া আমার শিয়রে বসিয়াছিল। আমি সবে মাত্র ঘুম হইতে জাগিয়া অনিমার মুখের দিকে

চাহিয়াছি, এমন সময় নীচে চন্দ্রবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম,—"সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু!" কি সর্ব্বনাশ!

ইথাকারাজ ইউলিসিস ট্র্য়-যুদ্ধ জয়ের পর স্বদেশ-প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে যাদুকরীগণের মোহিনী সঙ্গীতের আকর্ষণী শক্তিতে পাছে আত্মহারা হইয়া তাহাদের নিকট ধরা দেন, এই ভয়ে যেমন নিজের কর্ণরন্ধ্র মোম দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমিও তেমনই চন্দ্রবাবুর ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা বালিশ টানিয়া লইয়া কানের উপর চাপা দিলাম। কানে মোম দিয়াও ইথাকারাজ যেমন সুস্থ হইতে না পারিয়া নিজেকে মাস্তুলের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া-ছিলেন, আমিও তেমনই এক হাত দিয়া অনিমার বস্ত্রাংশ চাপিয়া ধরিয়া পড়িয়া রহিলাম! সে দিন ইথাকারাজের মতই আমি বিপদসাগর উত্তীর্ণ হইয়া গেলাম! শুনিলাম, চন্দ্রবাবু প্রায় মিনিট পাঁচেক আমার বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, শেষে ঠাকুরমা' যখন বলিয়া পাঠাইলেন, "সুরেশ বাড়ী নাই," তখন অগত্যা তিনি ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে বাটীর সন্নিকটস্থ সেই রেলিং-ঘেরা মাঠে গিয়া বসিলাম। মিনিট কয়েক বসিবার পর সহসা কাহার স্পর্শে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, চন্দ্রবাবু

আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছেন! আমার মাথা ঘুরিয়া গেল; ভয়ে আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলাম।

চন্দ্রবাবু আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আপনি বোধ হয় আমার ওপর খুব রাগ করছেন, না?" আমি নিরুত্তর হইয়া রহিলাম। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমার কিন্তু সে দিন কোন দোষ ছিল না—আপনার স্ত্রী যে আমার স্ত্রীকে বলে এসেছিলেন সে কথা আমি জানতাম না; আমার স্ত্রী পর দিন সে কথা আমায় বল্লেন; আমি তাকে সে জন্য খুব ব'কেছি। আজ সকালে আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা পাই নি। এইবার বলুন, আমায় মাপ করেছেন?"

আমি সব ভুলিয়া গেলাম! বিহ্বল হইয়া বলিলাম, "আপনি ও কি বলছেন চন্দ্রবাবু—আমি আপনাকে মাপ করব, সে কি কথা!"

চন্দ্রবাবু কহিলেন, "তা আমি জানি—আপনি আমার ওপর রাগ করতেই পারেন না। সেদিন ভিড়ের মধ্যে আপনার স্ত্রীর মোটেই খাতির-যত্ন করতে পারি নি, সেই জন্যে আমি বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত। কাল কিন্তু আপনার স্ত্রীকে আমাদের ওখানে যেতে হবে?"

আমি এগিয়ে গিয়া বলিলাম, "আমাদের জন্যে আবার কষ্ট ভোগ করা কেন ?"

চন্দ্রবাবু কহিলেন, "আপনি বলেন কি—বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীকে এক বেলা খাওয়াবার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হ'তে পারে !"

আধ ঘণ্টা গল্প করিবার পর চন্দ্রবাবু বিদায় লইলেন।

ঠাকুরমাকে গিয়া সমস্ত বলিলাম। তিনি কিছু বলিলেন না, একটু হাসিলেন ; তারপর সহসা গম্ভীর হইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

পরদিন দুপুর বেলা বিশু ও তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ করিলেন।

সন্ধ্যার সময় অনিমাকে সঙ্গে করিয়া চন্দ্রবাবুর বাটী উপস্থিত হইলাম। চন্দ্রবাবু স্বয়ং আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। কি খাতির! রাত্রি প্রায় দশটার সময় মুগ্ধ হইয়া আমরা গৃহে ফিরিলাম। অনিমাও সেদিন ভারি খুসী হইয়াছিল। রাত্রে আমায় বলিল, "চন্দ্রবাবু লোকটি দেখলাম খুব ভাল। তিনি দশ মিনিট অন্তর আমার খোঁজ নিয়ে গেছেন, বার বার এসে ওঁর স্ত্রীকে বলে গেছেন—'সে দিন এঁর মোটেই যত্ন হয় নি, দেখ, আজ যেন এতটুকু অযত্ন না হয়।' সত্যি বেশ লোক!"

অনিমার কথায় আমার হৃদয়সাগর আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল !

দিন দুই পরে চন্দ্রবাবু আমার বাড়ী আসিয়া বলিলেন, "দেখুন, একখানা মাসিক কাগজ বের করব স্থির ক'রেছি। তবে আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমি ত আর লেখা-পড়ার কিছু করতে পারব না, আমি শুধু টাকা দিয়েই খালাস—ও সব ভার থাকবে আপনার ! মনে করবেন সে আপনারই কাগজ—আপনি যাকে ইচ্ছে হয় সম্পাদক রাখবেন—যা ইচ্ছে ছাপ্‌বেন। আপনি হাতখরচের মত মাসিক এক শ' টাকা করে নেবেন, কি বলেন, এতে আপাততঃ আপনার চলবে ত ?"

আমার মনে হইল, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না আমার মতিভ্রম ঘটিয়াছে ? কিম্বা এ কোন দেবতার ছলনা ? আমি কি উত্তর দিব। একখানি মাসিক পত্রিকার সর্ব্বময় কর্ত্তা,—মাসিক এক শত টাকা হাত-খরচ ! এ যে স্বপ্নেরও অতীত।

এমন সময় চন্দ্রবাবু আমার হাতে দশখানি নোট দিয়া বলিলেন, "এই এক শ' টাকা আপনি রাখুন।"

নোট কয়খানির দিকে এক দৃষ্টে চাহিতে চাহিতে আমার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। এ ত স্বপ্ন নয় মতিভ্রমও

নয় দেবতার ছলনাও নয়! ওরে বিশু, ওরে কৃষ্ণ বলরামের দল, এইবার চেয়ে দেখ, আমার গোঁফদাড়ি কামান সার্থক হইয়াছে, তোরা সারা জীবন তপস্যা করিলেও এমন একজন বন্ধু তোদের ভাগ্যে জুটিবে না!

চন্দ্রবাবু চলিয়া গেলে, ঠাকুরমার হাতে এক শ' টাকার নোট দিয়া বলিলাম, "আমার এক শ' টাকা মাইনের চাকরী ঠিক্ হ'য়ে গেল।" একে একে ঠাকুরমার কাছে সব কথা খুলিয়া বলিলাম।

আমার এই সৌভাগ্য, এই আশাতীত উন্নতিতে ঠাকুরমা এতটুকু আনন্দ অনুভব করিলেন না, তিনি গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "জানিস্ ত, কথায় বলে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ! ওরে একটু সাবধান হ'য়ে চলিস্।"

ঠাকুরমার কথায় আমার রাগ হইল, হাসিও পাইল। তাঁহার বুদ্ধিহীনতার জন্য সত্যই আমার ভারি দুঃখ হইল!

সেদিন বিশু ও ঠাকুরমা বহুক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ করিলেন।

[১৮]

এক মাসের মধ্যেই খুব জাঁকজমক করিয়া কাগজ বাহির হইল। একজন নামজাদা লেখক সম্পাদক-

পদে নিযুক্ত হইলেন। তবে চন্দ্রবাবু আমাকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিলেন। কিন্তু আমি সম্পাদক মহাশয়ের পরামর্শ ব্যতীত বা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতাম না।

যথানিয়মে সম্পাদকের কাছে প্রবন্ধাদি লইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক-দল চতুর লেখক, সম্পাদক ও আমার উভয়ের মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। আমার কাছে আসিয়া বলিতেন, "সম্পাদক ত আপনিই—উনি ত খালি নামেই সম্পাদক। আপনি নিজের নাম সম্পাদক বলে ছাপালেই পারতেন, আপনি ত আর কোন বিষয়ে কারুর চেয়ে কম নন।" আবার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট গিয়া তাঁহারাই বলিতেন, "সুরেশবাবু ত ম্যানেজার, তিনি প্রবন্ধের কি বোঝেন,—তাঁর ত চিঠিপত্র লেখা কাজ!" আমরা দুজনেই তাঁহাদের এই কথায় খুব হাসিতাম।

বিদ্যাবুদ্ধিতে আমি যাঁহাদের পায়ের কাছে বসিবারও যোগ্য নহি, বয়সে যাঁহারা আমার অপেক্ষা অন্ততঃ বিশ বৎসরেরও বড়, এই রকমের দুই চারিজন অধ্যাপক প্রবন্ধ বাহির করিবার জন্য, এবং তাহারই সঙ্গে সামান্য কিছু অর্থ-প্রাপ্তির আশায় আমার খোসামোদ করিতেন, এমন কি তাঁহারা সময়ে সময়ে আমার সম্মুখেই বলি-

তেন, "আপনার মত সমজদার লোক খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যায়!"

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি—একে আমি বাঙ্গালী, তাহাতে আবার মূর্খ, কাজেই আমার পক্ষে মাথা স্থির রাখিয়া কাজ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। একদিন, কি কারণে মনে নাই, আমি একজন বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপককে কথায় কথায় কটু কথা বলিয়া অপমান করিলাম। তিনিও রাগ করিয়া আমাদের কাগজে লেখা বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং চারিদিকে সেই কথা রাষ্ট্র করিয়া আমাদেরই এক প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হায় রে দেশ, সেই অধ্যাপকই আবার দুদিন পরে সমস্ত অপমান পরিপাক করিয়া তুচ্ছ নাম ও সামান্য পঁচিশ টাকার লোভে আবার আমারই হাতে প্রবন্ধ দিয়া গেলেন! সত্যই আমার তখন কবির কথা মনে হইল, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক তুমি!" সব দিক দিয়া ইহা খাঁটি সত্য কথা! নহিলে একজন গণ্যমান্য অধ্যাপক—যাঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকে, জানিয়া শুনিয়া তিনি আমার মত একজন অশিক্ষিত (অবশ্য নিরক্ষর নয়!) লোকের কাছে মাথা নত করেন!

দেখিতে দেখিতে সম্পাদক মহাশয়ের ও আমার দু'চারিজন মোসাহেব জুটিয়া গেল। তাহারা প্রাণপণে আমাদের বেগার খাটিতে লাগিল। আমি দয়াপরবশ হইয়া মাঝে মাঝে তাহাদের দুই এক টাকা দিতাম, সময়ে সময়ে তাহাদের প্রবন্ধাদিও ছাপাইতাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শুনিতে পাইলাম, তাহারা বলিয়া বেড়ায়, "টাকা দিয়া ও তৈলমর্দ্দন করিয়া সুরেশ বাবু ও সম্পাদক মহাশয় আমাদের লেখা পান। আমাদের ঘাড়ে ভূত চাপে নাই ত, যে তাহাদের বেগার দিতে যাইব!"

তাহাদের এই ঘৃণিত ব্যবহারে আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্থির করিয়াছিলাম,—"তাহাদের আর এ মুখো হইতে দিব না।" কিন্তু সম্পাদক মহাশয় আমায় হাসিয়া বলিলেন, "তুমি অত চট্‌ছ কেন বাবাজি,—ও সব সইতে হয়। না হ'লে বেগার দেওয়ার লোক পাওয়া যাবে কি করে. আর একটু বয়স হ'লেই দেখতে পাবে, অধিকাংশ লোকেরই মশকবৃত্তি পেশা—তারা করে কি জান?—

"প্রাক্ পাদয়োঃপততি খাদতি পৃষ্ঠমাংসং
কর্ণে কলং কিমপি রৌতি শনৈর্বিচিত্রং।"

আমরা দুইজনেই তাহাদের মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করিতাম, কিন্তু বাহিরে দুটো মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাদের

হাতে রাখিতাম। এই মোসাহেবদের মধ্যে দুই তিনজন হেলিতে দুলিতে আমাদের অনুসরণ করিত! কি করেন, সম্পাদক মহাশয়, ক্রমে ক্রমে তাহাদের পত্রিকার লেখক করিয়া তুলিলেন।

যাক্ সে কথা। এখন আর আমি বিশুর অভাব এতটুকু অনুভব করি না। তাহাকে আর ভয়ও করি না। এখন আমার কিসের অভাব;—কিসের ভয়! পাঁচ টাকা খরচ করিলে অমন কত বিশু আসিয়া আমায় লিখিয়া দিয়া যাইবে! সাহিত্য-জগতে কিছুরই অভাব দেখিতে পাইলাম না। এই কলিকাতা সহরে যেমন গুণ্ডা ভাড়া পাওয়া যায়, তেমনই একদল লেখকও ভাড়া পাওয়া যায়, তবে সংখ্যায় তাহারা বড় কম; কিন্তু সংখ্যায় কম বলিয়া তাহারা অসম্ভব কিছু দাবী করিয়া বসে না। কেন না তাহারা যাহা পায়, তাহাই তাহাদের শক্তির তুলনায় অনেক বেশী বলিয়াই তাহারা মনে করে। এই রকমের একজন ভাড়াটিয়া-লেখক আমি নিযুক্ত করিলাম। মাঝে মাঝে সামান্য কিছু দিতাম, আর আমার বিপক্ষদলকে সে 'ন ভূত ন ভবিষ্যৎ' করিয়া গালাগালি দিয়া প্রবন্ধ টুকিয়া আনিত। আমি সম্পাদক মহাশয়কে ধরিয়া তাহা বাহির করিতাম।

এই ভাড়াটিয়া লেখকদের দু একজন এমন হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাদের দেখিয়াই মনে হইত, ইহারা যেন সাহিত্যক্ষেত্রের ষণ্ডামার্ক !

আমার পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে বলরাম একজন লেখক হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিমধ্যে তাহার বেশ নাম বাহির হইয়াছিল। আমি এত বড় কাগজের কর্ণধার, ভাবিয়াছিলাম, সমালোচনার জন্য সে নিশ্চয়ই আমার শরণাপন্ন হইবে; কিন্তু হায়, একখানা বই অবধি সে আমায় পাঠাইল না। আমি নিষ্ফল আক্রোশে মনে মনে গর্জ্জন করিতে লাগিলাম। এত বড় একখানা কাগজ আমার হাতে, আর আমি বলরামের মত একজন নগণ্য লেখককে (অবশ্য নগণ্য যে আমার নিকট, কিন্তু পাঁচজনের কাছে নহে) জব্দ করিতে পারিব না! একবার ভাবিলাম, না-ই দিলে বই, কিনিয়া সমালোচনা করিব, অর্থাৎ গালাগালি দিব। সম্পাদক মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে গেলে, তিনি বলিলেন, "কাজটা নীতি-বিরুদ্ধ, বই না পাঠালে সমালোচনা করা চলে না।" কাজেই অন্য উপায়ের সন্ধান করিতে লাগিলাম।

আমার ভাড়াটিয়া-লেখককে এই বিষয় জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেই সে কহিল, "ভাবনা কি? এ ত অতি সহজ

কাজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কেমন জব্দ করি দেখুন।” এই বলিয়া সে চাদরের ভিতর হইতে এক-খানি বই বাহির করিয়া কহিল, “এ আমার এক বন্ধুর লেখা বই; বেশ লিখেছে—এই বইয়ের সমালোচনা করবার সময় আমি আপনার কাজ উদ্ধার ক’রে দেব।”

আমি খুব খুসী হইয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। সেই মাসের কাগজেই ভাড়াটিয়া লেখকের বন্ধুর বইয়ের সুদীর্ঘ এক সমালোচনা বা স্তুতিবাদ বাহির হইল। সেই স্তুতি-বাদের মাঝখানে দেখিলাম, বেশ নির্লজ্জের মত সে লিখিয়া দিয়াছে—“এ বইখানি বলরামের বইগুলির মত অসার জঘন্য, অপাঠ্য, অবোধ্য নহে।” আমি মনে করিলাম, “বাস্, আর ভাবনা কি, বলরাম নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে, তার লেখার দফারফা করে দিয়েছি।” সমালোচকপ্রবর আসিতেই তাহার পিঠ চাপড়াইয়া খুব উৎসাহিত করিলাম। সেও আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া আর একটি টাকা হস্তগত করিয়া বিদায় লইল। কিন্তু হায়, বলরামের কলম ত বন্ধ হইল না! সে আমার অন্তরে হিংসার বিষ ঢালিয়া ক্রমাগতই লিখিতে লাগিল।

[১৯]

এ তো গেল আমার সাহিত্যিক জীবনের কথা। এখন যে কথা বলিতেছিলাম, সেইটাই আরম্ভ করি। এবার দেখিলাম, চন্দ্রবাবু একেবারে মুক্তহস্ত! (অবশ্য আমার সম্বন্ধে)! আগে হাঁটাহাঁটি কাঁদাকাটি করিয়াও মাসিক পঁচিশ টাকা আদায় করিতে পারিতাম না, এখন প্রতি মাসে এক শত টাকা অগ্রিম পাইতে লাগিলাম। সংসারে আর কোন কষ্ট রহিল না। বেশ স্বচ্ছন্দে সংসার চলিতে লাগিল। ঠাকুর্দ্দার পেন্‌সেনের এক পয়সাও খরচ হইত না, তাহা জমিত। তথাপি কিন্তু, ঠাকুরমাকে সময় সময় অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখিতাম। বিশুর সহিত তিনি প্রায়ই গোপনে কি পরামর্শ করিতেন। কেবল অনিমার মুখখানি আমি সর্ব্বদা প্রফুল্ল দেখিতাম। মনে করিতাম, আমার এই সৌভাগ্য-লাভে সে-ই কেবল সুখী। বিশুর সহিত আমি কচিৎ কথা বলিতাম; তাহার সাম্‌নে পড়িয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিতাম, "কেমন আছিস্ রে বিশু?" এই পর্য্যন্ত! সেও আমার সহিত কথা বলিবার জন্য বিশেষ কোন ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত না।

এই সৌভাগ্য-লাভের পর হইতে প্রতি সপ্তাহে

দুইবার চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আমার ও অনিমার নিমন্ত্রণ হইত। আমরা উভয়ে আনন্দে মসগুল হইয়া গৃহে ফিরিতাম।

কি জানি কেন বিশুকে প্রতিবারই চন্দ্রবাবুর বাড়ীর অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতাম! আমরা হয় ত কোন দিন রাত্রি দশটার সময় বাড়ী ফিরিতেছি, দেখি, বিশু চন্দ্রবাবুর গৃহের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া আছে! আমার কেমন ভয় হইত! বিশুর মতলব কি?

এমনই করিয়া ছয় মাস বেশ কাটিয়া গেল। চন্দ্রবাবু আমায় ও অনিমাকে শুধু নিমন্ত্রণ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না; তিনি এক এক দিন আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিতেন, "আজ সুরেশবাবু আপনার বাড়ী আমায় নিমন্ত্রণ করুন? তবে একটা কথা, আমার জন্যে বাজারের কোন তৈরী খাবার কিনে আনতে পারবেন না। আপনার স্ত্রীর হাতের রান্না খাব।"

আমি মহানন্দে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতাম। অনিমাও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া হাসিমুখে তাঁহার জন্য নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিত।

আমাদের বাড়ী পাচক ছিল না, কাজেই ঠাকুরমা কিম্বা অনিমাকেই পরিবেশন করিতে হইত। প্রথম দিন

ঠাকুরমাই পরিবেশন করিয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রবাবুর একান্ত আগ্রহে পরে অনিমাকেই পরিবেশন করিতে হইয়াছিল। অনিমা মাথায় এক হাত ঘোমটা টানিয়া পরিবেশন করিয়া যাইত। যদি কখনও তাহার মুখের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িত, দেখিতাম মুখখানি হাস্যোজ্জ্বল! আমি মনে মনে বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতাম।

ঠাকুরমা সমস্ত যোগাড়-যাগাড় করিয়া দিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে অত্যন্ত চঞ্চল দেখিতাম!

বিশুকে আমি কোন দিনই নিমন্ত্রণ করিতাম না, কিন্তু সে বিনা নিমন্ত্রণেই আসিয়া হাজির হইত। তবে সে আমাদের কাছে বড় ঘেঁসিত না। সব সময় ঠাকুরমার কাছে বসিয়া থাকিত; তাঁহারই পাতের প্রসাদ খাইত।

একদিন হঠাৎ চন্দ্রবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশুবাবুর সঙ্গে আপনার কদ্দিনের আলাপ সুরেশবাবু?"

আমি কহিলাম, "অন্ততঃ চোদ্দ পনর বৎসরের, আমরা ছেলেবেলায় এক সঙ্গে পড়েছি।"

চন্দ্রবাবু কহিলেন, "আপনার বাড়ীর মেয়েরা সবাই ওঁর সামনে বেরোন, কথাবার্ত্তা বলেন ত?"

আমি কহিলাম, "আমাদের বাড়ীতে মেয়েছেলে ত

মাত্র দুজন,—এক ঠাকুরমা, আর আমার স্ত্রী। তা আমার স্ত্রী বিশুর সাম্‌নে বেরোয়, কিন্তু কথাবার্ত্তা বলে না। আচ্ছা, হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করলেন যে?”

চন্দ্রবাবু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, “একটা কথা শুনেছিলাম,—থাকগে সে আর বলব না।”

আমার কেমন খটকা লাগিল! তিনি কি যেন হঠাৎ চাপিয়া গেলেন: সেটা কি, জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। আমার একান্ত পীড়াপীড়িতে তিনি যাহা বলিলেন, শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম!—কি সর্ব্বনাশ! বিশু এমন ভীষণ লোক! তাই বুঝি সে এখন এত ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছে? আমার মনে হইল, বিশুকে ত আমি প্রায়ই অনিমার দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।—এই ত সেদিন দুপুরবেলা আমি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, বিশু ঠাকুরমার সহিত গল্প করিতেছে, আর অনিমা ঠাকুরমার পিছনে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে। আমি প্রবেশ করিতেই বিশু আমাকে দেখিয়া যেন চমকিয়া উঠিল। চন্দ্রবাবুর কথা অতি সত্য; না হইলে বিশু সে দিন অমন করিয়া চমকিয়া উঠিবে কেন? আমি আর ভাবিতে পারিলাম না! মাথা ঘুরিতে লাগিল।

উন্মত্তের মত বলিয়া উঠিলাম, "আজ বিশুকে মেরে তাড়াব,—একবার বাড়ী ঢুকলে হয়! আপনি আমার যে উপকার করলেন চন্দ্রবাবু, তা আর কি বলব! কথাটা যদি চেপে রাখতেন, তা হ'লে আমি চিরদিনই অন্ধকারে থেকে যেতাম।"

চন্দ্রবাবু কহিলেন, "সে ত নিশ্চয়ই, তবে একটা কথা বলি;—যারা এ কথা বলেছে, তাদের মুখেই শুনেছি আপনার স্ত্রীর কোন অপরাধ নেই। বিশুর মতলব তিনি বুঝতে পারেন নি। আপনি বিশুকে তাড়িয়ে দেন, যা করুন তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আপনার স্ত্রীকে কিছু বলবেন না—তা হ'লে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়।"

আমি কহিলাম "আমার স্ত্রীকে শুধু সাবধান করে দেব।"

এমন সময় দেখিলাম, বিশু আমাদেরই সম্মুখ দিয়া ভিতরে যাইতেছে। আমি উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম। চন্দ্রবাবু ক্ষিপ্রপদে কক্ষের বাহির হইয়া গেলেন।

আমি দুই চোখ রাঙা করিয়া কহিলাম, "রাস্কেল—বেরো বলছি এখনই বাড়ী থেকে, ফের যদি কোন দিন ঢুকবি, তোকে খুন করে ফেলব।"

বিশু আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কি বলিতে যাইতেছিল—আমি, রাগ সামলাইতে পারিলাম না—সজোরে তাহার গালে এক চড় মারিলাম—এবং চীৎকার করিয়া কহিলাম, "হাসি! মজাটা টের পাইয়ে দেব। বিশ্বাসঘাতক বদমায়েস!"

আমার চীৎকার শুনিয়া ঠাকুরমা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

আমার যত রাগ পড়িল ঠাকুরমার উপর। উনিই ত বিশুকে আস্পর্দ্ধা দিয়া এই কাণ্ড বাধাইয়াছেন! ঠাকুরমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে, চাহিয়া কহিলাম, "এখানে কি করতে এসেছ, যাও ভেতরে।" ঠাকুরমা সে কথায় কানই দিলেন না। তিনি অগ্রসর হইয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। যাইবার সময় বিশুকে স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিয়া গেলেন, "বিশু বাড়ী যা, সেদিনকার শপথের কথা মনে থাকে যেন দাদা!"

বিশুর মুখে আবার সেই হাসি! আমি জ্বলিয়া গেলাম। সে কিছু না বলিয়া শুধু হাসিয়া চলিয়া গেল।

[২০]

এই ঘটনার পর হইতে চন্দ্রবাবু আরও ঘনঘন আমার বাড়ী আসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার গৃহে আমার ও অনিমার প্রায় প্রত্যহই নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল।

এই ভাবে দিন পনের অতিবাহিত হইয়া গেল। সে অবধি বিশুকে আর আমাদের বাড়ীতে দেখিতে পাই নাই। তবে পরে শুনিলাম, সে না কি গভীর রাত্রে আমার অজ্ঞাতসারে আসিয়া ঠাকুরমার সহিত দেখা করিয়া যাইত।

সেদিন বৈকালে বসিয়া আছি, এমন সময় চন্দ্রবাবু আসিয়া কহিলেন, "আজ রাত্রে আমায় নেমন্তন্ন করুন সুরেশবাবু।"

আমি মহানন্দে তাঁহার আহারের আয়োজন করিলাম।

বাটী ফিরিবার সময় আমায় তিনি বলিয়া গেলেন, "কাল আপনার ও আপনার স্ত্রীর নেমন্তন্ন রইল। এবার কিন্তু আমার এ কলকাতার-বাড়ীতে নয়, বাগান-বাড়ীতে কাল সবাই মিলে রাতটা বাগান-বাড়ীতে কাটিয়ে, পরং সকালে ফেরা যাবে। এতে আপনার কোন আপত্তি আছে?"

আমি বলিলাম, "কিছুমাত্র না, আমারও আজ ক'দি

ধরে ইচ্ছে হ'চ্ছিল, দু এক দিনের জন্যে কলকাতার বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসি। এ ভালই হ'ল।"

চন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন, "আপনারা কবি-মানুষ, আপনাদের এ-ইচ্ছা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক!"

আমি মোহিত হইয়া গেলাম।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে চন্দ্রবাবুর মোটর আসিয়া আমাদের গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল। পূর্ব্ব হইতে আমরা প্রস্তুত হইয়া ছিলাম। কালবিলম্ব না করিয়া অনিমাকে লইয়া আমি মোটরে উঠিলাম। ঠাকুরমার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার মুখখানি ভারি বিষণ্ণ।

আমাদের লইয়া মোটর কলিকাতার বাহিরে একটী নির্জ্জন উদ্যান-গৃহের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, আশেপাশে কোথাও লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। চারিদিকে কেবল বড় বড় বৃক্ষ ম্লান অন্ধকারের মধ্যে প্রেতের মত দাঁড়াইয়া আছে। কি জানি কেন আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল—অনিমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার মুখেও যেন প্রফুল্লতা নাই!

মোটরখানি একটী দ্বিতল-গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই চন্দ্রবাবু হাসিমুখে আমাদের মহা সমাদর করিয়া নামাইলেন।

আমাকে নীচের একটা সুসজ্জিত কক্ষে বসাইয়া কহিলেন, "আমি আপনার স্ত্রীকে উপরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।"

আমি অনিমার দিকে চাহিয়া বলিলাম, যাও অনিমা, ওঁর সঙ্গে উপরে যাও।"

অনিমা একবার আমার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া অসঙ্কোচে চন্দ্রবাবুর সহিত উপরে চলিয়া গেল।

একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া আমি উন্মুক্ত জানালার ধারে বসিলাম। সম্মুখে চাহিতেই দেখিলাম, ভাগীরথী তর-তর করিয়া বহিতেছে। আমি এক মনে সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। প্রায় মিনিট দশেক উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবুও চন্দ্রবাবু আসিলেন না। আমি চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

এমন সময় দেখিলাম, বিশু দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছে। এ কি! এই নির্জ্জন উদ্যান-গৃহে বিশু কোথা হইতে আসিল! কি সর্ব্বনাশ! আমার মন আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ পরে সহসা একবার অনিমার ভীতিবিহ্বল কাতর কণ্ঠস্বর যেন আমার কর্ণে প্রবেশ করিল; আমি শিহরিয়া উঠিলাম। এ কি! কি হইল! তবে কি বিশু অন্তর

অনুসরণ করিয়াই এখানে আসিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া উপরে চলিয়া গেলাম।

একটি কক্ষে প্রবেশ করিতেই স্তম্ভিত হইয়া দেখিলাম, বিশু কঠিন হস্তে চন্দ্রবাবুকে ধরিয়াছে, আর অনিমা মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

আমাকে দেখিয়াই চন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন, "আর একটু হ'লে সর্ব্বনাশ হ'য়েছিল, বিশু আপনার স্ত্রী—"

তিনি কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই আমি উন্মত্তবৎ ছুটিয়া গিয়া সবেগে বিশুকে আক্রমণ করিলাম। আমার হাতে একগাছি ছড়ি ছিল, তাই দিয়া সজোরে বিশুর মাথায় এক ঘা বসাইয়া দিলাম,—তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত ছুটিতে লাগিল!

বিশু আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল! সেই হাসি!

ইতিমধ্যে চন্দ্রবাবু হাত ছাড়াইয়া লইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "দরোয়ান, দরোয়ান?"

দেখিতে দেখিতে দুই জন ভীমকায় দরোয়ান আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

চন্দ্রবাবু বিশুকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ডাকু, ডাকু, পাকড়াও।"

তাহারা তখন বিশুকে বন্দী করিল। বিশু কোনরূপ

বাধা দিল না। কেবল তাহাকে বাঁধিবার পূর্ব্বে সে একবার হাত নাড়িয়া যেন বাহিরে কাহাকে কি ইসারা করিল।

দরোয়ানেরা তাহাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিতেছে, এমন সময় সভয়ে চাহিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণ, বলরাম ও বিশুর আর তিনজন বন্ধু সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে এক একটি পিস্তল বাহির করিয়া দরোয়ানদ্বয়, চন্দ্রবাবু ও আমার সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "যদি একটা কথা কেউ বলবি, তখনই গুলি করে মেরে ফেলব।"

দরোয়ানেরা বিশুকে ছাড়িয়া দিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; চন্দ্রবাবুর মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, আর আমি ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম।

এমন সময় বলরাম বিশুর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ তোকে মেরেছে।" সেই সঙ্গে সঙ্গে সে সজোরে চন্দ্রবাবুর নাকে এক ঘুসি মারিল। তিনি নাকে হাত চাপিয়া বসিয়া পড়িলেন। গল্‌গল্‌ করিয়া তাঁহার নাক দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। আর কিছু আমি দেখিতে পাইলাম না; অন্ধকার, গভীর অন্ধকার আমার দৃষ্টিশক্তি রোধ করিয়া ফেলিল।

তার পর জ্ঞান লাভ করিয়া চক্ষু মেলিতেই দেখিলাম,

অনিমা আমার শিহরে বসিয়া হাওয়া করিতেছে। ঠাকুরমা মাথায় জল দিতেছেন, আর বিশু অদূরে দাঁড়াইয়া আছে। বিশুর কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আমি আবার সভয়ে চক্ষু মুদিত করিলাম।

ক্রমে ক্রমে আমি সব কথা জানিতে পারিলাম। অনিমার মানসম্ভ্রমরক্ষাকারী বিশুকে আমি প্রাণপণে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিলাম! এতদিনে তাহাকে চিনিলাম।

তবে একটা বিষয়ে অনেক দিন ধরিয়া আমার খটকা ছিল। একদিন বিশুকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঁ্যারে বিশু তোরা অতগুলো পিস্তল পেলি কোত্থেকে?"

বিশু হাসিয়া কহিল, "ও রকম পিস্তলের অভাব কি! চার আনা খরচ করলে যে কোন দোকানে পাওয়া যায়।"

আমার ময়ূরপুচ্ছ এবার সত্যই খসিয়া গিয়াছে। আমি আবার সওদাগরী আফিসে চাকুরীতে ভর্ত্তি হইয়াছি।

শুনিলাম বলরামের সেই ঘুষিতে চন্দ্রবাবুর নাকের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; তাহা আর জোড়া লাগে নাই! তজ্জন্য তাঁহাকে ছয় মাসের উপর শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল।

সমাপ্ত